

বাঘ হাতি হরিণ

বিমলকুমার ভট্টাচার্য

বাঘ হাতি হরিণ

বিমলকুমার ভট্টাচার্য্য

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

BAGH HATI HARIN
by
Bimalkumar Bhattacharya
Rs. 6·00

প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৭২

—

ও রি য়ে ণ্ট লং ম্যা ন লি মি টে ড

রেজিস্টার্ড অফিস :
৩/৫ আসফ আলী রোড · নয়াদিল্লী ১

আঞ্চলিক অফিস :
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ · কলকাতা ১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট · বোম্বাই ১
৩৬এ মাউণ্ট রোড · মাদ্রাজ ২
বি-৩/৭ আসফ আলী রোড · নয়াদিল্লী ১

—

প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ · কলকাতা ১৩

মুদ্রক : শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট · কলকাতা ৪

—

নির্ভীক অব্যর্থলক্ষ্য শিকারী
স্বর্গত প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য্য আই. এ. এস-এর
স্মৃতিতে
বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে দিলাম।

ভূমিকা

'বাঘ' মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে বার হয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রীমতী জয়ন্তী সেন বিশেষ সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী বীণা রায় বর্মণ, শ্রীমতী রেণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বীথি সেনের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে অনেক সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আশা করি, বাংলার তরুণ-তরুণীরা বইটি পড়ে ভয়কে জয় করতে, বিপদকে তুচ্ছ করতে এবং বনজঙ্গল ও বন্য জন্তুকে ভালবাসতে শিখবে।

বিষয়-সূচী



বাঘ ...

মাত্র তেরো বছরের বালক, বড়দের পাখি শিকারের আজ্ঞাবহ অনুচর। দয়া ক'রে কেউ কেউ ঘুঘু ও বক মারবার অনুমতি দেন, অনেক কাকুতি-মিনতির পর। তার হাতের টিপ দেখে এক দূর-সম্পর্কীয় শিকারী কাকা তো প্রায়ই তাকে সঙ্গে নিতেন।

একদিন সকালে পাঁচ মাইল দূর থেকে একদল লোক এসে তাঁকে বলল, বাঘ কাছের জঙ্গলে গরু মেরেছে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে দুজনে রওনা হলেন। বড় শিকারীর সঙ্গে বন্দুক নিয়ে ও ব্যাণ্ডোলিয়ারে চকচকে গুলি ভরে বুক ফুলিয়ে ছোট শিকারীও চলল। সেই দূরের গ্রামে গিয়ে 'বড় শিকারী' ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়লেন। প্রায় বেহুঁশ। মাচায় ওঠা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

এদিকে গ্রামের লোকেদের কিন্তু বিষম বিপদ। বাঘ গরু-বাছুর আর রাখছে না। একজন মাতব্বর তখন বললেন, ছোট শিকারী তো রয়েছেন, তিনিই মাচায় বসুন। সকলে একবাক্যে সায় দিল। ব্যাণ্ডোলিয়ারই তার কাল হল।

বালকটির কিন্তু বুক ঢিপ ঢিপ করছে। বাঘ সে কখনও দেখেনি, চিড়িয়াখানাতেও নয়। ওদিকে জ্বরের ঘোরের মধ্যেই শিকারী তার হাতে দু'টি বুলেট ও দু'টি এল-জি গুলি দিলেন, সেই সঙ্গে টর্চ।

মাচায় ওঠার প্রায় দু-ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মাচা দশ হাত উঁচু। নিচে ছোট একটা গরু পড়ে আছে ; পেটের দিকটায় কিছু নেই বললেই চলে। যত অন্ধকার হয় ছোট শিকারীর ভাবনা তত বাড়ে। প্রথমে বুলেট, না এল-জি ? টর্চ কখন জ্বালতে হবে ?—এইসব চিন্তায় সে আকুল হয়ে ওঠে। কিছুই যে সে জানে না !

অন্ধকারে গাছের তলাতেই শুকনো পাতার খরখর শব্দ আরম্ভ হল। সর্বনাশ, বাঘ এল নাকি! শুনেছিল, কাশির শব্দে বাঘ পালিয়ে যায়। 'খুক' 'খুক'—কিন্তু খরখর শব্দ থামে না। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! অনেক ভেবে-চিন্তে জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগ্'। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ থেমে গেল। মাচার উপরে বালকটিও বাঁচল হাঁপ ছেড়ে।

কিন্তু অনভিজ্ঞতার এই গ্লানি মুছে ফেলতে হবে। তারপর থেকে শুরু হল জানার চেষ্টা কি ক'রে শিকার করতে হয়। কিন্তু নিজের বন্দুক তো নেই! তাই তোষামোদ ক'রে শিকার-পার্টিতে গিয়ে শিকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও বই পড়ে কিছু অভিজ্ঞতা হল। এক ভীষণ নেশা পেয়ে বসল তাকে।

এর চোদ্দ বছর পরে নিজের বন্দুক হল। ছুটিতে গোমোর কাছে বেড়াতে গিয়েছি। বেলা প্রায় চারটেয় খবর পেলাম, একটা ডোরা-কাটা বাঘ অর্থাৎ রয়াল টাইগার একটা গরু মেরেছে। তবে বেশি খেয়ে যেতে পারেনি। মাচা করবার সময় নেই। আর তখন কিই-বা হাতে-কলমে জানি! গ্রামের লোকে সকলে মিলে একরকম জোর করেই গাছে তুলে দিল। পাছে বন্দুকের ধাক্কায় পড়ে যাই, নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধলাম। দুই ডালের মাঝখানে বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, হঠাৎ দেখি, এক বিশাল দাঁতালো শুয়োর চার-দিকে তাকিয়ে নিয়ে মড়ির বুকের দিক থেকে খেতে শুরু করল।

অবাক হয়ে দেখছি। জানতাম না যে শুয়োর মাংস খায়। মিনিট দশেক পরে এসে গেল বিরাট আকারের এক বাঘ। আড়চোখে বরাহপুঙ্গব তাকে দেখতে লাগল। বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে বাঘ ধীরে ধীরে পেটের দিক থেকে খাওয়া আরম্ভ করল। নিশ্চয় খুবই ক্ষুধার্ত ছিল দুজনেই। দুজনে দুজনের উপর নজর রেখেছে। বাঘের উপর বন্দুক নিশানা করতে গিয়ে দেখি যে কয়েকটি ডালপালা সামনে এমনভাবে আছে যে তাক করা অসম্ভব। বাঘ ছেড়ে শুয়োরকে গুলি

করতে মন চাইছে না। তবু নাই-মামার চেয়ে কানামামা ভালো, এই ভেবে শুয়োরকে গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিকট ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ও গর্জন।

পরমুহূর্তে দেখি বরাহ তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে বাঘের পেট চিরে ফেলেছে। গুলি লাগতে সে নিশ্চয় ভেবেছিল, বাঘই তাকে আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অসম্ভব কপালের জোরে আর এক গুলিতে শুয়োর আর বাঘ দুইই পেলাম।

শিক্ষা হল জঙ্গল কি ভীষণ জায়গা! এখানকার কানুন, মারো কিংবা মরো। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি যে বনে বাঁচতে হলে, বিশেষত বাঘের জঙ্গলে প্রাণ বাঁচাতে হলে, জানোয়ারের স্বভাব, গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হবে।

বাঘের কথা

শক্তি ও সৌন্দর্যে বাঘ বন্য প্রাণীদের মধ্যে অতুলনীয়। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, বর্মা, মালয়, পারস্য, ভারতবর্ষ, মধ্য-এশিয়া ও ককেসাস অঞ্চলে বাঘ দেখা যায়। ভারতবর্ষে বাঘ এসেছে শীতপ্রধান মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া থেকে। এখানে কালক্রমে তার গায়ের লোম বিরল হয়ে গিয়েছে ও শারীরিক দৈর্ঘ্যও কমেছে।

আগেকার শিকারীরা কেউ কেউ বারো ফুট বা তারও কিছু বেশি লম্বা বাঘের কথা বলেছেন। এখন কিন্তু সাধারণত দশ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি বাঘ ও নয় ফুট ছয় ইঞ্চি বাঘিনী খুবই বড়। মাপবার নিয়ম দু'রকম। বাঘকে চিত ক'রে শুইয়ে নাকের কাছে একটা খুঁটি এবং লেজের শেষে আর একটা খুঁটি রেখে মাপা। এইটি এখন চালু। আরেকটি হচ্ছে, নাকের ডগা থেকে মাথার উপর দিয়ে লেজের শেষ পর্যন্ত মাপা। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। বাঘের লেজ ত্রিশ ইঞ্চি থেকে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি (এবং প্যান্থারের

আটাশ ইঞ্চি থেকে আটত্রিশ ইঞ্চি) পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে মারবার সঙ্গে সঙ্গে মাপা উচিত। পরে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ছোট হয়ে যায়। চামড়া খুলে তৈরি ক'রে নিয়ে মাপলে দেখা যাবে যে বাঘের চামড়া প্রায় ছ'ফুট বেড়ে গিয়েছে (এবং চিতা অর্থাৎ লেপার্ড, কি প্যান্থারের বেড়েছে প্রায় এক ফুট)।

বাঘের ওজন হয় সাধারণত চারশো কুড়ি পাউণ্ড ও বাঘিনীর প্রায় তার অর্ধেক। খুব বড় বাঘ ছয়শো পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনেরও হয় দেখা গিয়েছে। বাঘিনীর পায়ের আঙুল একটু লম্বাটে ধরনের। মাঝের আঙুল সামান্য একটু বড় হয় কখনো কখনো। বাঘের আঙুল বাঘিনীর লম্বাটে আঙুলের তুলনায় ভোঁতা ও মোটা এবং তার তলার মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ প্যাড) চওড়া, বাঘিনীর মতো লম্বা ধরনের নয়। পায়ের ছাপ ভালো ক'রে দেখলেই বোঝা যায় যে জন্তুটা বাঘ না বাঘিনী। এতে শিকারীর খুব সুবিধা হয়। দূর থেকে দেখলে বাঘিনীর মাথা সাধারণত প্রায় গলার মতো চওড়া দেখায়। বাঘের মাথা গলার চেয়ে চওড়া, চোয়াল ভারি। পাছে বাঘের সংখ্যা ভবিষ্যতে কমে যায় এবং দুধের বাচ্চা থাকলে মায়ের অভাবে তারা না খেতে পেয়ে মারা যায়, সেইজন্য জেনেশুনে এবং বিপদে না পড়লে শিকারী কখনও বাঘিনীকে গুলি করবে না।

বনের রাজা বাঘ। এত শক্তি ও ক্ষিপ্রতা অন্য কোনো জন্তুর নেই। বাঘের দাঁত ও নখ ভীষণ তীক্ষ্ণ। সামনের দু'টি থাবায় এত জোর যে এক আঘাতে যে কোনো জানোয়ারের মাথা চূর্ণ ক'রে দিতে পারে। ছয় ফুট উঁচু দেওয়াল সে বিনা আয়াসে পার হয়ে যায়, যদিও বারো ফুট উঁচু বেড়ার উপর সে সহজে লাফ দেবে না। লম্বালম্বি কুড়ি ফুট পেরিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সহজ এবং উঁচু জায়গা থেকে ত্রিশ ফুট নিচে লাফিয়েও সে শিকার ধরতে পারে। এরকম প্রবল জন্তুর হাত থেকে কেউই নিস্তার পেত না যদি না তার ঘ্রাণশক্তি দুর্বল হতো। বাঘের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তি ভারি তীক্ষ্ণ ; কথায় বলে—'টেলিস্কোপিক' চোখ ও 'মাইক্রোফোন' কান। একটু খুট শব্দও তার কানে গিয়ে

তাকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়। রাতেও অনেক দূর পর্যন্ত সে সব দেখতে পায়। শুঁকতে সে যে একেবারে পারে না তাও হয়ত সত্য নয়। মালয়ে কখনো কখনো মাটির ওপর দিয়ে চক্রাকারে পচা মাংস টেনে নেওয়া হয় এবং বাঘ তার গন্ধ অনুসরণ ক'রে নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হয়। রক্ষা, বাঘ ভদ্র প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় খুবই কম এবং ওপরের দিকে সে তাকিয়ে দেখে না।

খুব প্রয়োজন হলে কোনো কোনো বাঘ, বিশেষত বাঘিনী অথবা ছোট বাঘ, গাছে উঠতে পারে; যদি হেলানো গাছ হয় এবং কাছে কাছে ডাল থাকে, তা হলে তো খুব ভালোই হয়। শিকারীদের ভাগ্য ভালো যে শতকরা একটা কি দুটো বাঘ গাছে উঠতে পারে। নদী বা জলাশয়ে সাঁতার কাটা তার পক্ষে অতি সহজ। গরমকালে দুপুরবেলায় বাঘ জলে মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে থাকতে চায়। গরম তার বেশি সহ্য হয় না। এমন কি গরম পাথুরে জায়গায় বেশি হাঁটলে তার পায়ে ফোসকাও পড়তে পারে। এঁটুলী বা 'টীক' এদের খুব কষ্ট দেয়। এঁটুলীগুলি বাঘের গায়ে আস্তানা গেড়ে সারা গা চুলকনিতে ভরিয়ে দেয়। বাঘ মারা গেলে এঁটুলীরা তাকে ছেড়ে দিয়ে কাছে-পাওয়া শিকারীর কি অন্য মানুষের গায়ে এঁটে বসে যায়। হরিণ জাতীয় সম্বরের এঁটুলী কিন্তু এমনভাবে মানুষের গায়ে বসে কষ্টকর হয়ে ওঠে না।

চিতা দেখতে সুন্দর, কিন্তু ভীষণ ধূর্ত ও শয়তান, অসম্ভব হিংস্র ও নির্মম। চিতার দৃষ্টি একটু প্রখর, এবং সে স্থির জিনিসও তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। গাছের ওপরও তার নজর, এবং কাছাকাছি থাকে বলে গ্রামের মানুষকে সে ভালোভাবেই চেনে। তবে চিতার কান হয়ত বাঘের মতো প্রখর নয়।

মনে হয়, সে বুদ্ধি খাটিয়ে শিকার ধরে। সামান্য ঝোপে, এমন কি আট-নয় ইঞ্চি ঘাসে সে সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে। গুলি খেয়ে সে মরার ভান করে এবং শিকারী কাছে এলেই তাকে মরণ-কামড় দেয়। তাই কথায় বলে, চামড়া না ছাড়ানো পর্যন্ত ভেব না

যে চিতা মরেছে। চিতা অযথা অনেক প্রাণীকে হত্যা করে। কিন্তু বাঘ সহজে তা করে না। বাচ্চা কাছে থাকলে বাঘিনী, কিংবা মিলন-কালে পুরুষবাঘ, অথবা শিকার শেখার পর বাঘের বাচ্চারা বাপ-মাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য, মাঝে মাঝে ক্ষুধার অতিরিক্ত শিকার করে। কিন্তু চিতা বিনা কারণেই প্রাণিহত্যা করে। হঠাৎ সামনাসামনি হলে মানুষ দেখে বাঘ হয়ত সরে যাবে কিংবা চুপ ক'রে দেখবে ; কিন্তু চিতার প্রকৃতি অন্য রকম। হঠাৎ কাছাকাছি পেলে সে মানুষকে আক্রমণ ক'রে বসবে।

অনেক বছর আগেকার কথা। সবে শিকার আরম্ভ করেছি। মধ্যপ্রদেশের বনে একটি ঝোপ পার হতেই এক চিতা লাফ দিয়ে আক্রমণ করল। বন্দুক কাঁধেই রইল, নামাবার সময় পেলাম না। এক বিচক্ষণ শিকারী বন্ধুর কাছে শোনা কথামতো ক্ষিপ্রগতিতে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে সে চলে গেল বিশেষ দ্রুতগতিতে, যেন শিকার পালিয়ে যেতে একটু লজ্জা পেয়েছে।

সব চিতাই বেরালের মতো তরতর ক'রে গাছে উঠে যেতে পারে। গাছ থেকে নামে মাথা নিচের দিকে ক'রে, ভাল্লুকের মতো মাথা ওপরের দিকে ক'রে নয়। কখনো কখনো শিকার ক'রে গাছের ওপর রেখে দেয় এবং নিজেও ডালের ওপর শুয়ে থাকে কিংবা শিকারীর জন্য অপেক্ষা করে। গাছে উঠে শিকারীকে আক্রমণ করেছে, এমনও শোনা গিয়েছে। আবার গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে সুবিধা-মতো শিকারও ক'রে থাকে।

হাজারীবাগে চাতরায় এক যুবক শিকারী গাছে-থাকা এক চিতাকে গুলি করেন, কিন্তু ভুল ক'রে গাছের গোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকেন। গুলি খেয়ে চিতা গাছ থেকে পড়েই তাঁকে আক্রমণ ক'রে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেয় এবং তার পরে গুলির আঘাতেই মরে যায়।

ঝিনাইদহে (বাংলাদেশে) এক জমিদার এই রকম বিপদে পড়েছিলেন। চিতা গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁকে আক্রমণ ক'রে মাটিতে

ফেলে দিল। শিকারী তাঁর গলা বাঁচাবার জন্য নিজের বাঁ হাতটা চিতার মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। চিতা ভীষণ হিংস্রভাবে হাত চিবিয়ে চলল। শিকারীর দোনলা বন্দুক কাছাকাছি মাটিতে পড়ে। অনেকেই চাষ করছিল, কিন্তু অসীম সাহসে এগিয়ে এল তাঁরই প্রজা ষোলো বছরের এক যুবক মুসলমান চাষী। জমিদারবাবু তাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বললেন—বন্দুকের ঘোড়া তুলে ট্রিগার টেনে চিতার গায়ে ঠেকিয়ে গুলি করতে হবে। চিতা হাত চিবিয়েই খাচ্ছে, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কথামতো কাজ করে বীর যুবকটি শিকারীর প্রাণ রক্ষা করল। তবে হাতটি তাঁর মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে দেখেছিলাম।

চিতা, প্যান্থার কি লেপার্ড, হরিণের মহা শত্রু। হরিণ-শিশু ও মাদী-হরিণ তাদের বড় প্রিয়। কারণ বড় হরিণ কি শুয়োরকে সে সহজে কাবু করতে পারে না। বলে রাখা ভালো, প্যান্থার ও লেপার্ডে তফাত বিশেষ নেই। প্যান্থার আকারে বড়, লোকালয় থেকে দূরে গভীর জঙ্গলে কি পাহাড়ে থাকতে ভালোবাসে, আর লেপার্ড লোকালয়ের কাছে থেকে গরু, কুকুর, ছাগল শেষ করে। প্যান্থারের গুল বা কালো চক্র লেপার্ডের চেয়ে কম ঘন এবং ভেতরটাও কম কালো। সাধারণত লেপার্ড সাড়ে পাঁচ কি ছয় ফুট লম্বা হয় এবং প্যান্থার সাড়ে সাত ফুট পর্যন্ত দেখা যায়।

কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশে মাণ্ডলা জেলায় আমার হাতে একটি আট ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা প্যান্থার মারা যায়। আকার ছিল বিরাট। একটা বড় বাঘিনীর মতো দেখতে, তার পাঞ্জাও বাঘের মতো। রাত দুটোয় তাকে প্রথম যখন দেখলাম, মনে হয়েছিল একটি রয়াল টাইগার বা বাঘ। অতি সাবধানে রবারের জুতো-পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম, যেন সে অন্য পাহাড়ে না চলে যেতে পারে।

কিন্তু আমায় দেখে ফেলে চিতা ত্রিশ গজ দূর থেকে চার্জ করল। হৃৎপিণ্ডে একটা গুলি খেয়েও সে তিন-চার হাত এগিয়ে এল আক্রমণের ভঙ্গিতে। দ্বিতীয় গুলিতে সব শেষ। এত বড় চিতা দেখে

আমার সাথী বাবু খাঁ ড্রাইভারের উল্লাস আমি আজও ভুলতে পারিনি।

ঐ রাতেই দেখলাম একটা শিকারী চিতা বা 'হান্টিং' চিতা। ভারতবর্ষ থেকে এদের বংশ লোপ পেতে বসেছে। আগে রাজা-মহারাজারা এদের পোষ মানিয়ে হরিণ, বিশেষত কৃষ্ণসার, শিকার করতেন। জঙ্গলের কাছে মাঠে নিয়ে চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে হরিণ ধরা হতো। এদের গতি এত ক্ষিপ্র যে, যে হরিণ একশো গজ দূরে থাকত তাকেও দুশো গজের মধ্যে ধরে ফেলত। পুরস্কার স্বরূপ সে পেত এক পাত্র রক্ত ও একটু মাংস। এদের কালো গুল সম্পূর্ণ কালো, চিতা বাঘের মতো মাঝখানে ফিকে নয়, পা লম্বা লম্বা, মুখ একটু গোল ধরনের, নাক কালো এবং পায়ের থাবাতে কুকুরের মতো নখ বেরিয়ে থাকে; বাঘ, চিতা বা বেরালের মতো নয়। বলা বাহুল্য, এই চিতাকে মারবার জন্য রাইফেল তুলিনি পর্যন্ত; কারণ, মনে হল এইটেই বোধহয় ঐ অঞ্চলের একমাত্র জীবিত 'হান্টিং' চিতা।

মাঝে মাঝে সাদা বাঘ কি কালো চিতা দেখা যায়। ১৯১৫ সালে রেওয়াতে (মধ্যপ্রদেশে) একটা সাদা বাঘ ধরা পড়ে। পরে আরও পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালে রেওয়াতে গোবিন্দগড় রাজবাটিতে আমি প্রথম সাদা বাঘ দেখি। এখন সাদা বাঘ অনেক পশুশালায় আছে। তাদের বিশেষত্ব, সাদা গায়ে কালো ডোরা, ঘাড়ের কাছে সামান্য ফিকে হলদে।

কালো চিতা ভিন্ন জাতের নয়। আসামের ও দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে এদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। চামড়ার রঙের গোলমাল হওয়াতেই (যাকে ইংরেজিতে বলে 'মেলানিজম') রঙ একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। আলোতে কালো গুলগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এদের আকৃতি যেমন ভীষণ, প্রকৃতিও তেমনি।

সাধারণত বাঘ বাঁচে পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত। সারা বছরেই তাদের মিলন হতে পারে, কিন্তু মিলনের পক্ষে মার্চ-এপ্রিল ও অক্টোবর-নভেম্বরই প্রকৃষ্ট সময়। তেরো থেকে পনেরো সপ্তাহের পর

বাচ্চা হয়, সংখ্যা দুই থেকে চার। কিন্তু কখনও কখনও ছয়টা বাচ্চাও হতে দেখা গিয়েছে। বাচ্চা হবার আগে বাঘিনী বাঘের কাছ থেকে পালিয়ে যায়, পাছে বাঘ বাচ্চাদের মেরে ফেলে। জন্মাবার সময় বাচ্চার চোখ বন্ধ থাকে, কিন্তু গায়ের ডোরা বেশ স্পষ্ট থাকে। চিতার বাচ্চার কালো দাগগুলো কিন্তু প্রথম অবস্থায় পরিষ্কার দেখাই যায় না। বাচ্চারা যখন চার মাস বয়সের হয়, অর্থাৎ বাবাকে সমীহ ক'রে চলার জ্ঞান হয়, তখন বাঘিনী বাঘের কাছে ফিরে আসে। বাচ্চা দু-বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার কাছে থেকে শিকার ধরতে শেখে। তখন তাদের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় সাড়ে সাত ফুট। পাঁচ বছর বয়সে বাঘ পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়। চোখ খোলার পরও কিছুদিন মাতৃদুগ্ধই খায়। পরে বাঘিনী আধ-হজম করা মাংস উগ্‌রে ফেলে একটু একটু খেতে দেয় এবং তারপর দেয় কাঁচা মাংসের টুকরো। ধীরে ধীরে শিকারের সব কায়দাই শেখায়। নিজেদের সামনে শিকার করায় ও দোষ-ত্রুটি বুঝিয়ে দেয় মৃদু গর্জন ক'রে কিংবা থাপ্পড় দিয়ে।

বাঘিনী সবসময় বাচ্চাদের বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য তৈরি। সেই সময় মানুষের খুবই সাবধান হওয়া উচিত, কারণ বাঘিনী তার শাবকের অমঙ্গলের ভয়ে অহেতুক হিংস্রভাবে আক্রমণ করতে পারে। এ বিষয়ে চিতা আরও বেশি সন্তানবৎসল ; এবং বাচ্চা হবার পর স্ত্রী-চিতা পুরুষ-চিতার কাছ থেকে পালিয়ে যায় না। এখানে বলে রাখা ভালো যে বাঘ শিকার ক'রে বাঘিনী বা বাচ্চাকে আগে খেতে দেবে না ; আগে নিজে খাবে, পরে স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু পুরুষ-চিতা এরকম স্বার্থপর নয়, সে তাদের একসঙ্গেই খেতে দেবে, একটু আগে আরম্ভ করলেও দোষ নেই।

বাঘ যখন শিকারের অন্বেষণে থাকে, কিংবা সাবধানে শিকারের পেছু নেয়, তার পেছনের পায়ের দাগ পড়ে সামনের পায়ের দাগের ওপর। তবে যখন মোড় নেয়, কিংবা থামে অথবা খুব জোরে হাঁটে তখন চার পায়েরই ছাপ মাটিতে পড়ে। এই পায়ের ছাপ থেকেই

বাঘের দৈর্ঘ্য অনুমান করা যায়। বাঘ ও বাঘিনীর পায়ের ছাপের পার্থক্যের কথা আগেই বলেছি।

গ্রাম্য কুকুরদের মতো বাঘেদের আবার 'জুরিস্‌ডিক্‌শন' বা নিজ নিজ এলাকার জ্ঞান আছে। এক বাঘের রাজ্যে আর এক বাঘ ঢুকবে না, সে যদি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না থাকে। বাঘ তার নখ পরিষ্কার করার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাছের গায়ে নখ ঘষে এবং জঙ্গলে এমন চিহ্ন অনেক চোখে পড়ে—নতুন কিংবা পুরনো। আগন্তুক বাঘ বোধ হয় এইসব চিহ্ন দেখে 'যঃ পলায়তি স জীবতি' ভেবে সরে পড়ে।

শিকারের সন্ধানে ঘোরার সময় বাঘ কখনো কখনো মৃদু কান্নার শব্দ করে। আর একটি শব্দ করে—'পুক পুক'; অনেকটা সম্বর-শিশুর ডাকের মতো। মনে হয়, এটা সাথীকে জানিয়ে দিতে যে সে কোথায় আছে। মড়িতে আসবার আগে অন্য জন্তুদের সরিয়ে দেবার জন্যে আর একটি শব্দ করে—'খুস খুস'; হঠাৎ বিরক্ত হলে 'ছপ' শব্দ ক'রে বাঘ চলে যায়। কখনো কখনো বাঁধা শিকার দেখেও এই শব্দ করে। খুশি থাকলে জোরে 'মিয়াও' শব্দ বেরিয়ে আসে। রেগে গেলে প্রথমে অনেকটা প্লেন ছাড়ার আওয়াজের মতো শব্দ করে এবং পরে গর্জন ক'রে ওঠে—মানুষ সাবধান!

মিলনের সময় বাঘ ভীষণ গর্জন করে সাথীর সঙ্গে একত্র হবার জন্যে। 'হৌঙ্গ' 'হৌঙ্গ', 'এওঙ্গ' 'এওঙ্গ,' গর্জন শোনা যায় ভোরে ও সন্ধ্যায়। এটা শিকারের ডাক। বনের রাজার গর্জনে সব পশুপাখি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মাটি যেন কাঁপতে থাকে। এই গর্জন আরও প্রচণ্ড হয় বাঘ যখন হাঁকা অথবা 'বীট' ভেদ ক'রে চলে যায়। ময়ূর ও অন্যান্য পাখিরা চেঁচিয়ে ওঠে, বানররা 'খব্বর' 'খব্বর' ক'রে ডেকে ওঠে—কি হবে, কি হবে! ঠিক আক্রমণ করার সময় বাঘের 'হঃ হঃ' শব্দ ভীতিপ্রদ। এই নাদ শুনে বিচক্ষণ শিকারী ছাড়া আর কেউ ঠিক থাকতে পারে না। তারপরই আক্রমণ, লেজটি দু-তিনবার ওপরে-নিচে জোরে নেড়ে, শেষ মুহূর্তে উর্ধ্বে তুলে ধরে।

মানুষের যাতায়াত যেখানে নেই সেখানে বাঘ দিনেই শিকারের

জন্তে বেরিয়ে পড়ে। নইলে, রাতই তার শিকারের শ্রেষ্ঠ সময়। মাঝে মাঝে বর্ষাকালে বৃষ্টির পর কিংবা মেঘলা দিনে সে দিবাভাগেই চলে আসে। জন্তুদের চলাচলের রাস্তা দিয়ে, বন-বিভাগের জংলী রাস্তা (যাকে 'ফায়ার লাইন' বলা হয়) অথবা নালার ভিতর দিয়ে সে চলাফেরা করে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, আহত হলে বাঘ নালার ভিতর দিয়ে না গিয়ে পাশ দিয়ে চলে যায়, জলের ধারে ওত্ পেতে থাকে, গরুর পালের শেষ গরুটির ওপর নজর রাখে কিংবা অনেক রকম শব্দ করে যাতে জন্তুরা ভয়ে ডেকে উঠে তাদের অবস্থান জানিয়ে দেয়। খাবারের অন্বেষণে সে রাতে বহুদূর পর্যন্ত চলে যায়। কুড়ি মাইল হাঁটা তার কাছে খুব বেশি নয়, পাঁচ-দশ মাইল তো কিছুই নয়। ভালো শিকার পেলে তার পরে দিন-চারেক আর কোনো খাবারের দরকার হয় না, দুদিন খাবারের জন্য বিশেষ ব্যস্তও হয় না। বাঘ দু-তিন দিন ধরে মাংস পচিয়ে খায়, কখনও কখনও চার-পাঁচ দিনের পচা মাংসও খায়। কিছু খাবার না পেলে সে অন্যের মারা মাংস খেতেও নারাজ নয় ; এতে চিতা সিদ্ধহস্ত। বাঘকে কখনো কখনো ঘাস খেতে দেখা গিয়েছে এবং জঙ্গলের নোনা জায়গার নুনও সে মাঝে মাঝে খায়। প্রায় সবসময়ই বাঘের দাঁতের চিহ্ন থাকে জন্তুর ঘাড়ে। চিতার মড়ি হলে এগুলো থাকে গলায়। দলে চরছে এমন শিকারের কাছে খুব সাবধানে এসে বিদ্যুদ্‌বেগে এগিয়ে পলকমাত্র থেমে, নিজের পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বাঘ লাফ দিয়ে জন্তুটির পিঠে ওঠে। সামনের একটি পা গলার দিকে ও আর একটি পা নাকের কাছে রেখে জোরে ঘাড়টিকে পিছনের দিকে টানে। জোরে পেট দিয়ে জন্তুর পেছন দিকে চেপে তাকে বেগে মাটিতে ফেলে দেয় এবং যে-ধার থেকে আক্রমণ করেছিল তার উলটো দিকে লাফিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড় ভেঙে যায়।

একবার মধ্যপ্রদেশের এক জঙ্গলে মাচা থেকে ছয়শো গজ দূরে দূরবীণের সাহায্যে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, বাঘ কি ক'রে একটা সম্বর মারল। বাঘের ভয়াবহ ও অপূর্ব কলা-কৌশলে স্তম্ভিত হয়ে

যেতে হয়। সে রক্ত চুষে খায় না। যতক্ষণ দাঁত বসে থাকে রক্ত পড়ে না। ছোট বাঘ যদি বড় শিকার ধরে সে সামনের পায়ে চেপে ধরে; পিছনের পায়ে ভর রেখে গলা কামড়ে ঝুলে থাকে যতক্ষণ শিকারের মধ্যে প্রাণের কিছু-মাত্র চিহ্ন থাকে। হাতি মহিষ কি বাইসনের প্রথমে নিম্নাঙ্গে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। বড় জন্তু, যথা মহিষ বাইসন ষাঁড় বলদের পিছনের পায়ের শির কেটে দেয় যাতে ভারি জন্তু তিন পায়ে বেশি লড়তে না পারে।

চিতা গলা কামড়ে শিকার মেরে ফেলে। তার দাঁতের দাগ থাকবে গলায়। অবশ্য বড় চিতা ঘাড় কামড়ে মারে বাঘের মতো। মৃত জন্তুটি বাঘের শিকার না চিতার শিকার বোঝা যায়, কোথায় দাঁতের দাগ আছে—ঘাড়ে বা গলায়—তাই দেখে। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হয়, শরীরের কোন্ অংশ থেকে খেতে আরম্ভ করেছে। এ-বিষয়ে পরে বলছি।

শিকারের জন্যে বাঘ যখন ওত্ পেতে থাকে, কিংবা তাকে ধরবার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, সে সময় তার খেয়াল থাকে বাতাসের ওপর—কোন্ দিক থেকে বাতাস বইছে। সে সব সময় চায় যে বাতাস শিকারের কাছ থেকে তার দিকে আসবে, যাকে ইংরেজিতে 'আপ-উইণ্ড' বলে। উলটো হলে শিকার যে তার গন্ধ পেয়ে দূর থেকেই পালাবে। বাতাসের গতি বুঝে বাঘ ঘুরেফিরে শিকার করে।

হরিণ মারা পড়ে মাঠে চরবার সময়। জঙ্গলে যখন তারা স্থির-ভাবে, লুকিয়ে থাকে বাঘ তাদের অবস্থান বুঝতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ বাঘ সামনে এলে তারা ছুটে পালাবার চেষ্টা করে এবং এতেই অনেকে বাঘের কবলে পড়ে।

বাঘ সাধারণত শিকার মেরে তার গলায় দাঁত বসিয়ে তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু জন্তুটি বেশ ভারি হলে তাকে কামড়ে পিছন দিকে টানতে গিয়ে, সে নিজে পিছিয়ে পড়ে; ফলে অনেক সময় খাদে পড়ে শিকারের ভারে থেঁতলে যেতে পারে।

দেখা গিয়েছে যে, গ্রাম্য গরু মহিষ মারার পর তাড়া খেলে বাঘ

কখনো কখনো মড়ি ছেড়ে চলে যায়। সময় সময় ক্ষুধার্ত থাকলে সে অবশ্য রাখালকে আক্রমণ করে। সে বোধহয় বোঝে, মানুষের গরু-মহিষ মেরে সে কি অন্যায় করেছে। কিন্তু বন্য পশু, বিশেষত শুয়োর কি সজারু, মারলে সে কিছুতেই নড়বে না, বরং গর্জন করবে, কি আক্রমণ করবে। এই দু'টি যে তার অতি প্রিয় খাদ্য! হয়ত ভাবে, বন্য পশুর ওপর মানুষের কি এখ্‌তিয়ার আছে? মড়ি যদি খোলা মাঠে ফেলে যায়, বুঝতে হবে সে খাবার জন্যে আবার ফিরে আসবে না। কারণ শকুন তাকে খেয়ে ফেলবে জেনেও অমন ক'রে ফেলে গিয়েছে। অবশ্য মহিষ কি বাইসনের মতো বড় জানোয়ার (যা টানা একটু শক্ত) হলে বাঘ ফিরে এসে খাবে। মেঘলা দিন হলে তাড়াতাড়ি, অর্থাৎ অন্ধকার নামবার এক ঘণ্টার মধ্যে, ফিরে আসবে; এবং যদি বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থামলেই তাকে দেখা যাবে।

শিকার ক'রে একটু খেয়ে বাঘ মড়িকে অনেক সময় লতাপাতা ঘাস কি ডালপালা দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢেকে রাখে। এমন কি ঘাস কামড়ে কামড়ে নিয়ে আসে ঢেকে রাখবার জন্যে। এরকম হলে বুঝতে হবে, বাঘ আবার খাবার জন্যে ফিরে আসবে।

বামদিকে মড়ি পড়ে থাকলে বাঘ আর আসবে না, এ ধারণার মূলে কোনো সত্য নেই। খাবার আগে বাঘ শিকারের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার ক'রে একটু দূরে সরিয়ে রাখে। অবশ্য দারুণ ক্ষুধা থাকলে এটা করবার সময় থাকে না। সে সব সময়ই পেছন থেকে বা লেজের গোড়ার দিক থেকে খেতে শুরু করে। চিতা প্রথম খেতে আরম্ভ করে পেটের দিক থেকে এবং তারপর সে ক্রমে ক্রমে খাবে যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও বুকের হাড়ের ওপরের মাংস। শিকারী এই থেকে চট ক'রে বুঝে নেন যে মড়িটি বাঘের না চিতার। এটা কিন্তু মনে রাখা উচিত যে চিতা খুব বড় হলে বাঘের মতোই খেতে শুরু করে।

বাঘ পারতপক্ষে মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু মানুষখেকো হয়ে উঠলে, মানুষ ছাড়া আর কিছু তার খেতে ভালো লাগে না, এবং তখন মনে হয়, সে মাথা খাটিয়ে নরহত্যা চালাচ্ছে। বিপদ হল এই-খানে। কিন্তু বাঘ মানুষ মারলেই তাকে মানুষখেকো বলা যায় না। অনেক সময় হঠাৎ দেখা হলে কি ক্ষুধার সময় বিরক্ত করলে, অথবা বাঘিনী বাচ্চা নিয়ে থাকাকালে কি তাদের মিলন-কালে রেগে হঠাৎ মানুষকে আক্রমণ করে, কিন্তু খায় না। গ্রাম্য গবাদি পশু শিকার করার সময় রাখাল যদি তেড়ে যায়, বাঘ তাকে হয়ত মেরে ফেলবে, খাবে না সব সময়। বার-কয়েক এরকম হলে বাঘের লোভ হতে পারে মানুষের নোনা রক্ত ও মাংসের ওপর।

বাঘ মানুষখেকো হয় নানা কারণে বা পরিবেশে। বাঘিনী যদি বাচ্চাদের মানুষের মাংস খাইয়ে মানুষ করে, বড় হয়ে তাদের মানুষের মাংসের ওপর লোভ থেকে যায়। মিলন-কালে কখনো কখনো মানুষখেকো বাঘিনী যদি বাঘকে মানুষ খেতে শেখায়, তার এ-অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে যায়। জঙ্গলে হরিণ শুয়োর প্রভৃতি না থাকলে বা কমে গেলে বাধ্য হয়ে বাঘ মানুষ খায়। অন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াইয়ে আহত হলে, অথবা বড় কাঁটা কি সজারুর কাঁটা বিদ্ধ হলে বাঘ আর আগের মতো শিকার ধরতে পারে না। সজারু তার প্রিয় খাদ্য। থাবা দিয়ে তাকে ধরতে গেলে সজারুর কাঁটা তার পায়ে অথবা মুখে ঢুকে যায়। তাতে তার সাধারণ শিকারের ক্ষমতা চলে যায় অথবা খুব কমে যায়। বার্ধক্যে যখন তার শক্তি-সামর্থ্য চলে যায় ও দাঁত ভেঙে যায় অথবা ঘষে ঘষে দাঁত ছোট হয়ে যায় তখন সে শিকারকে ধরে রাখতে পারে না। এমনও দেখা গিয়েছে যে গ্রামে মহামারীর পর লোকে মৃতদেহ সৎকার না ক'রে ফেলে দেয় জঙ্গলে কি নালায়, লোকাভাবে অথবা অর্থাভাবে। ঐ সহজলভ্য মাংস খেয়ে বাঘের মানুষের মাংসের প্রতি লোভ বেড়ে যায়।

মানুষের ওপর ভয় একবার কেটে গেলে, তাকে ধরা কত সহজ একবার বুঝে নিতে পারলে,বাঘ হিংস্র নরখাদকে পরিণত হয়। তখন সে রীতিমতো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ মারে। মানুষখেকো বাঘ সাধারণত দিনেই শিকার করে। মানুষখেকো চিতা কিন্তু মানুষ মারে বেশির ভাগই রাতে। সে গ্রাম চেনে আগে থেকে। মানুষের কাজকর্মের সময় জ্ঞানও তার থাকে। কি ক'রে গরীব মানুষের ঘরের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হয়, সে জানে। এইজন্য নরখাদক চিতা ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

বাঘ এমনভাবে মানুষ মারে যাতে সহজে কেউ তার সন্ধান না পায়। আজ এখানে মারছে, কাল ওখানে। একটি মানুষ মারার পর বাঘ অনেক সময় বহু দূরে চলে যায়। কতদিন পরে সে একই জায়গায় আবার ফিরে আসবে, তারও নিয়ম আছে। যদি ম্যাপে তাদের 'মড়ির' তারিখ রেখে রীতিমতো গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা যায়, তবে অনেকটা সঠিকভাবে বলা যাবে যে কবে আবার পুরানো জায়গায় ফিরে এসে সে মানুষ মারবে। কোনো কোনো মানুষখেকো বাঘ নয় থেকে তেরো-চোদ্দ দিনের ভিতর পুরনো এলাকায় ফিরে আসে। তবে এবিষয়ে সঠিকভাবে জানতে হলে তার মানুষমারার ইতিহাস অর্থাৎ কোন্ দিন ও কোন্ এলাকার মধ্যে হত্যাকাণ্ড চলেছে, তা ভালো ক'রে পরীক্ষা করা দরকার।

'বীট' ক'রে মানুষখেকোকে সহজে বার করা যায় না, কারণ মানুষ মেরে খেয়ে সে সেখান থেকে সরে পড়ে। বোঝে যে মানুষ প্রতিশোধ নেবে। আর মারার পর যা হৈ-হল্লা হয় তাতে সে কিছুদিনের জন্য এলাকা ছেড়ে চলে যেতে চায়। মাচা ক'রে মারাও শক্ত, কারণ মাথা, হাতের তালু ও পায়ের তালু ছাড়া প্রায় সবটাই সাধারণত সে খেয়ে পালায়, দ্বিতীয়বার খাবার জন্য আর মড়িতে ফেরে না। গ্রামের লোকেরা মাচার তলায় মড়ি রাখতে দিতে চায় না। কারণ এতে মৃতের অপমান করা হয়। সুতরাং শিকারী অর্ধভুক্ত মড়ি পেলেও তাকে সামনে রেখে মাচায় বসার সুযোগ পাবে না। গ্রামের শিকারীদের

মন কুসংস্কারে পূর্ণ। তাদের মধ্যে একটি ধারণা আছে যে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা মড়ির হাত দিয়ে বাঘকে জানিয়ে দেবে শিকারী কোথায় বসে আছে এবং যে লোক মানুষখেকোর সন্ধান দেয় সে কোথায় আছে। মৃতের প্রেতাত্মা নাকি মানুষখেকোর মাথার ওপর বসে বাঘকে চালিয়ে নিয়ে যায় ঐ সন্ধানদাতাকে মারার জন্য। সত্যিকারের শিকারীকে গ্রামে কত অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়!

বাঘ দিনে মারে সাধারণত সেই সব লোককে যারা জঙ্গলের ধারে চাষ করে, অথবা ঘাস কাটে, কিংবা গাছ কাটে। গ্রামের মেয়েরা প্রায়ই মারা পড়ে জল আনবার সময়, বাসন মাজা কি স্নান করবার সময়। তাদের ওপর মানুষখেকো হঠাৎ বিরাট দৈত্যের মতো লাফিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরে নিয়ে চলে যায়। হতভাগী হয়ত একটু চিৎকার করল, কিংবা গাছপালা হাত দিয়ে চেপে বাঁচবার বৃথা চেষ্টা করল, তার সাথীরা সব দেখল, কিন্তু কি করবে! ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে এই নিদারুণ খবর জানিয়ে দেয়। গ্রামের লোকেরাই বা কি করবে? বন্দুক তো নেই, শিকারীরও অভাব। অপূর্ব সাহসের সঙ্গে তবু তারা লাঠিসোটা নিয়ে জঙ্গলে ছোটে; যদি মৃতের দেহটা পাওয়া যায়, অন্তত অন্ত্যেষ্টি করার জন্য। বারে বারে এমনটি হলে ভয়ে যারা পারে গ্রাম ছেড়ে পালায়। যারা থাকে, তারা ক্ষেত-খামারের কাজ প্রায় বন্ধ ক'রে দেয়। গ্রাম থেকে দূরে গিয়ে শৌচ করাও চলে না। গ্রাম, এমন কি সারা তল্লাট, খাঁ খাঁ করতে থাকে।

যেখানে মানুষখেকোর উৎপাত হয়, শিকারীকে সে জঙ্গলে খুবই সাবধানে চলতে হয়। মানুষখেকো সাধারণত পেছন থেকেই আক্রমণ করে, তবে মাঝে মাঝে পাশ থেকেও করতে পারে, বাতাসের গতি দেখে। যদি শিকারীর ডান দিক থেকে বাতাস বয় তবে আক্রমণ আসবে বাঁ দিক থেকে, আর বাঁ দিক থেকে বাতাস বইলে আক্রমণ আসবে ডান দিক থেকে। তাই শিকারীকে প্রথমে জানতে হবে কোন্ দিক থেকে বাতাস বইছে। শিকারের জন্য জঙ্গলে ঢুকলে সব আগে এইটি বোঝা দরকার।

প্রকৃত শিকারীকে ধৈর্য ধরে এবং সব রকম বুদ্ধি খাটিয়ে এই-ভাবে বাঘের পেছনে লেগে থাকতে হয়। মানুষখেকোরা সব সময় মানুষ খায় না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গো-মহিষও খায়। শিকা-রীরা তাই চেষ্টা করেন ওদের বেঁধে রেখে বাঘ মারতে।

অনেক বছর আগে মধ্যপ্রদেশে আমি এক মানুষখেকোর সন্ধানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। সেটি মড়িতে দ্বিতীয়বার আসে না, গরু-মহিষও ছোঁয় না, ভীষণ চালাক। শেষে ঠিক করলাম শুয়োর কি ঘোড়া বেঁধে, দিনে জঙ্গলের রাস্তার চৌমাথায় যেখানে তার পাঞ্জার চিহ্ন পেয়েছিলাম, তার কাছেই মাচায় থাকব। এখানে বলা দরকার, যেসব মানুষখেকোরা গরু-মহিষ খেতে আসে না, তাদের শুয়োর কি ঘোড়ার মাংসে লোভ হতে পারে। একটা শুয়োর নিচে বেঁধে মাচায় বসলাম।

মানুষখেকোর নজর ছিল কাঠুরেদের ওপর। তিনজন কাঠুরেকে সে কাঠ কাটবার সময় মেরেছিল। তাই এক আদিবাসীকে মাচার উলটোদিকে গাছে কুড়ুল দিয়ে খট্ খট্ শব্দ করতে বললাম। সেই শব্দ শুনে শয়তান বাঘ এগিয়ে এসে শুয়োরটিকে দেখতে পেয়ে গুটি গুটি গিয়ে যেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল, অমনি উপর্যুপরি দুবার গুলি চালিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করলাম। সরল গ্রামবাসীদের কাছে যে আনন্দ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পেয়েছিলাম তা আজও ভুলিনি। সার্থক হল সব কষ্ট। বাঘটির দৈর্ঘ্য ছিল নয় ফুট এক ইঞ্চি। সামনের পায়ে একটা সজারুর কাঁটা আড়াআড়িভাবে ছিল। বয়সও তার হয়েছিল।

হাজারীবাগে অনেক বছর আগে এক শিকারী পোস্ট অফিসের পিওন সেজে এক নরখাদককে মারেন। মেল-রানাররা আগে বর্শা কি বল্লম ও তার তলায় ঘণ্টা বেঁধে ডাক নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যেত জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পাহাড়ের উপর দিয়ে। এইরকম দুজন রানারকে খাবার পর সেই শিকারী রানার সেজে ঘণ্টা বাজিয়ে যেতে যেতে

মানুষখেকোকে দেখতে পেয়ে রাইফেলের গুলিতে মেরে ফেলেন।

সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘের কথা কে না জানে! সেখানকার বাঘ প্রায়ই নরখাদক। জনবিরল বসতি। মানুষকে ভয় করে না মানুষখেকো। মৌচাক দেখতে দেখতে গাছের ওপর দৃষ্টি রেখে লোকে দল বেঁধে চলে জঙ্গলের মধ্যে। হঠাৎ শেষের লোকটির কোনো খোঁজ নেই। তাকে বাঘে ধরেছে। এমন ক'রে বছরের পর বছর কত দরিদ্র, কত অভাগা যে প্রাণ হারায় তার ঠিকানা নেই।

মাছ ধরবার জন্য এসে জেলেরা মাঝ-নদীতে নৌকো বেঁধে ঘুমোয়। সাঁতরে বাঘ একজনকে মুখে তুলে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। দিনে দুপুরে মাছ ধরছে, তখনও লাফিয়ে জেলেদের একজনকে নিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে জঙ্গলে চলে যায়। কদাচ এমন অবস্থায় কেউ বাঁচে। কিছুকাল আগে পর পর প্রায় ত্রিশজন লোক এক নরখাদকের হাতে মারা পড়ে। তার মধ্যে ছয়জন শিকারী। একজন অভিজ্ঞ শিকারীও ছিলেন। তিনি রাত্রের প্রথম প্রহরে নৌকোয় নিজে পাহারা দিয়েছিলেন, পরে অন্য দুজনকে পাহারায় রেখে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অন্য দুজন শিকারী নিজেদের কর্তব্য না ক'রে ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই মুহূর্তে বাঘ নদী সাঁতরে নৌকো থেকে শিকারীকে নিয়ে অদৃশ্য হল।

ছয়দিন ধরে ঐ বাঘকে মারবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম, কিন্তু বেশি ছুটি না থাকায় ফিরে যেতে হয়েছিল। শুনেছিলাম, বাঘটা (বাংলাদেশের) সুন্দরবনে চলে গিয়েছিল।

সুন্দরবনের মানুষখেকোরা ভয়ংকর। অনেক বছর আগে এক দরিদ্র চাষী জঙ্গলের এক কোণে চালাঘর বেঁধে বাস করছিল। একদিন রাত্রে শুনতে পেল ওপরে খসখস শব্দ। কে যেন খড় সরিয়ে ভেতরে আসছে। ঘরের মধ্যে চাষী, তার স্ত্রী ও পুত্র কাঁপতে আরম্ভ করল। পরমুহূর্তে এক ভীষণদর্শন বাঘ ওপর থেকে ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চাষীর স্ত্রীকে নিয়ে অদৃশ্য হল। ঠিক ঐভাবে একমাস পরে তার ছেলেকে বাঘে ধরল। শোকে উন্মত্তপ্রায় চাষী প্রতিজ্ঞা করল যে সে প্রতিশোধ নেবেই।

প্রতি রাত্রে ঘরে আগুন জ্বেলে সে প্রকাণ্ড বর্শার ফলা গনগনে গরম ক'রে রাখত সব সময়, কখন শয়তান আবার আসবে। প্রায় দশ-দিন পরে সেই সুযোগ মিলল। আবার খসখস শব্দ। ধপ শব্দ হবার আগেই চাষী ফুটোর কাছে লাল বর্শাফলক ধরে মাটিতে চেপে ধরে থাকল। বাঘ লাফিয়ে পড়ল তারই ওপর। হিস্‌হিস্‌ পোড়বার শব্দ, ভীষণ গর্জন, তারপর সব শেষ। শাবাশ চাষী!

নয় বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে আমাকে এক নরখাদক বা নরঘাতক বাঘের সামনাসামনি হতে হয়েছিল। বড়দিনের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বাঘের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে নিরাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সন্ধ্যার মুখে ফিরে এলাম জঙ্গলের বাংলোতে। রাইফেল থেকে টর্চ খুলে রেখেছি। জুতো ছেড়ে স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়েছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক মোটরে ক'রে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, এক শিকারী বাংলোতে এসেছেন শুনে তিনি জানাতে এসেছেন যে এই-মাত্র আধ মাইল দূরে রাস্তায় আসতে আসতে একটি বাঘ তাঁর গাড়ি আক্রমণ করার জন্য ভীষণভাবে তেড়ে এসেছিল।

তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জুতো পরবার কি রাইফেলে টর্চ লাগাবার সময় পেলাম না। চৌকিদারের হাতে একটা টর্চ দিয়ে গাড়িতে বসলাম। বাংলো থেকে বেরিয়ে দেড়শো গজের মধ্যে বাঘের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ওপর আক্রমণ চালাল প্রায় একশো গজ দূর থেকে। একপাশে জঙ্গল শুরু হয়েছে সেখান থেকে। সে আছে একটু উঁচু জায়গায়। আমাদের মাঝখানে এক নালা। লাফ দিয়ে জীপ থেকে রাইফেল নিয়ে নেমে পড়লাম। বাঘকে নালার এধারে আসতে দেওয়া চলবে না। সুতরাং রাইফেল তৈরি ক'রে তাকে দৌড়ে আক্রমণ করলাম।

আগে আক্রমণকারী বাঘ মেরেছি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। এবারে পদ্ধতি বদলাতে হল বিপদের মুখে। এমনিতেই উঁচু জায়গা থেকে বাঘের সুবিধা ; নালা পেরোলে আমার আরও অসুবিধা। এতদিনের

অভিজ্ঞতা যেন বলে দিল, বাঘের মাথায় গুলি ক'রো না, ক'রো না। সহজে তার মগজ নষ্ট হবে না, যদি না তুই চোখের মাঝখানে গুলি লাগে।

বাঘটা কখনও মানুষকে আক্রমণ করতে দেখেনি, এতদিন সে-ই সকলকে আক্রমণ করেছে। বোধহয় বিস্ময়ে এক সেকেণ্ড থামল। সেই মুহূর্তেই গুলি লাগল তার তুই পায়ের মাঝখানে বুকে। বুঝলাম, গুলি তার সর্বশরীর ভেদ করেছে। নালায় বাঘটা পড়ে গেল, আমি পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলাম রাইফেল তৈরি রেখে। আলো নেই। গাড়ির হেডলাইটের আলো সামনে, বাঘ তো পাশে। বেচারা চৌকিদার টর্চ ফেলেছিল গাছের ওপর। কখনোও অমন বাঘ সে জঙ্গলে দেখেনি—আক্রমণ করতে দেখা তো দূরের কথা। ঠক ঠক ক'রে তার হাত কাঁপছে। ভাগ্যক্রমে গাছের পাতা থেকে প্রতিফলিত আলোতে নিচের বাঘকে একটু দেখা যাচ্ছিল। বাঘটা মরেছে কি আহত হয়েছে জানি না। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে জঙ্গল খুবই গভীর হয়েছে। রাতে কিছুই করা যাবে না। হঠাৎ নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, কখন এক পায়ের স্যাণ্ডাল পড়ে গিয়েছে। একটি-মাত্র স্যাণ্ডাল পায়ে। জঙ্গলের বাংলোতে চার-পাঁচ জোড়া বিভিন্ন প্রকারের জুতো। অথচ বাঘ যখন মারলাম এক পায়ে স্যাণ্ডাল! লোক পাঠিয়ে জঙ্গলের কাছের গ্রামের লোকদের বলে দিলাম, তারা যেন আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে জঙ্গলে ঢোকে না, কিংবা গরু-মহিষ ছাড়ে না।

সতেরো মাইল দূরে বনবিভাগের এক হাতি ছিল। এক ট্রাক-ড্রাইভারের হাতে চিঠি লিখে পাঠালাম যেন অবিলম্বে হাতি আসে। ভোর ছ-টার সময় রাইফেল তৈরি ক'রে একাই গেলাম গতরাত্রের জায়গায়। দেখলাম প্রচুর রক্ত, ফেনাযুক্ত অর্থাৎ ফুসফুসের। গাছের গায়ে গায়ে রক্ত। বাঘ সোজা না যেতে পেরে একবার এধারে একবার ওধারে গিয়েছে। আঘাত মারাত্মক, বুঝলাম। যেখান থেকে জঙ্গল গভীর হয়েছে ততদূর গেলাম আর ফিরে এলাম। বেলা

এগারোটায় হাতি এলে, গভীর জঙ্গলে ঢুকতেই দেখি, সকালে যতদূর গিয়েছিলাম সেখান থেকে পনেরো গজ দূরেই বাঘটা মরে পড়ে আছে। এরপর মধ্যপ্রদেশে দু'বার আমি আক্রমণকারী চিতাকে চার্জ ক'রে মারি, ওই এক সেকেণ্ডের সুযোগ নেবার জন্যে।

শিকারপদ্ধতি

পায়ে হেঁটে শিকার করার আনন্দ প্রকৃত শিকারীর কাছে অপরিসীম। জঙ্গলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়। জঙ্গল যে ভালো ক'রে জানে এমন একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে। পশুপক্ষীদের সঙ্গে পরিচয় না হলে, তাদের স্বভাব জানা না থাকলে, জঙ্গলের রাস্তাঘাট না বুঝলে শিকার করা কঠিন। শারীরিক সামর্থ্য থাকলে দশ-পনেরো মাইল পায়ে হাঁটা কষ্টকর নয়।

এই রকম হেঁটে শিকার করার সময় আমার অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়। ১৯৩০ সালে একবার মধ্যপ্রদেশে রাজনন্দগাঁও-এ যাই। বন্ধুবর ডাক্তার মুখার্জীর অতিথি। একদিন শিকার অন্বেষণে দু'জনে আমরা দু'দিকে চলে যাই। আমার সঙ্গে থাকে একজন আদিবাসী, জঙ্গলে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। হঠাৎ আমার হাত ধরে সে ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসমতো আমার কাঁধে রাইফেল উঠল। কিন্তু দূরে তাকিয়ে দেখি যে জটাজুটধারী ক্ষীণকায় ভস্মবিভূতিকৌপীন-সর্বস্ব এক সাধু জঙ্গলে গাছতলায় যোগাসনে বসে আছেন। অবাক হয়ে যাই, এই বনে একা তিনি কি ক'রে আছেন। রাইফেলের জোরে আমরা সাহস ক'রে ঢুকি, আর তিনি নির্বিকারচিত্তে বসে আছেন। কাছে গিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাই। সাধু মাটি থেকে নয় ইঞ্চি উপরে শূন্যে পদ্মাসনে বসে আছেন। নিচু হয়ে পরীক্ষা করছি, এমন সময় তিনি চোখ মেলে মৃদু হাসলেন। আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার

করলাম। মনে হল, তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। তাড়াতাড়ি মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। আদিবাসী জানত কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। বন্ধুবর সব শুনে অবাক হলেন। ঠিক করা গেল, পরের দিন সকালে আমরা সেখানে যাব। কিন্তু কোথায় সাধু! সর্বত্যাগী মহাপুরুষ অন্তর্ধান করেছেন।

যাক্ সে কথা। বাঘ-শিকারের নানা পদ্ধতি আছে। সেই সম্বন্ধে এখন কিছু বলা দরকার। পরে মাচা-শিকার ও বীট-শিকার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে। শিকারীর প্রথম চেষ্টা হবে বাঘ কোথায় আছে তা জানা ও তাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসা। এর জন্য টোপ (অর্থাৎ 'বেট') বাঁধা প্রকৃষ্ট উপায়।

নিপুণ ও নির্ভীক শিকারী পায়ে হেঁটে দেখেন বাঁধা 'বেট' বা 'টোপ'কে বাঘ কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছে। পাঞ্জার দাগ, মড়ির রক্ত, মাটিতে টানার দাগ দেখে তিনি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে এগুবেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গের শিকারী কোনো কথা বলবেন না, জুতোর শব্দও যেন না হয়। পায়ে পাথর লেগেও যেন শব্দ না হয়। গাছের কি পাথরের আড়ালে আড়ালে এবং দরকার হলে ঘুরে-ফিরে যেতে হবে। নালার ভিতর দিয়ে যাওয়া চলবে না এবং বড় বড় ঘাস ও ঘন জঙ্গল পাশ কাটাতে হবে। বন্দুক নিজের হাতে থাকবে। চিল, শকুন, শেয়ালের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে। তারা অনেক খবর দেয়। গাছে শকুন থাকলে বুঝতে হবে যে বাঘ কাছেই আছে। বাঘ নিকটে থাকলে পাখিরা কিচির-মিচির শব্দ করবে। সম্বর, চিত্রা, ও কাকুর হরিণ ডাকবে ; তার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো ময়ূরও।* ময়ূরের চোখ সকলের চেয়ে তীক্ষ্ণ। আর হনুমান থাকলে তো কথাই নেই। তাদের সতর্ক প্রহরী সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং

---

* সম্বর : ঢ্যাং ঢ্যাং অং
চিত্রা : ওঁ-ওঁন (টেঁ্য-ওন)
কাকুর : হা : খর্‌খর্
ময়ূর : কোয়াঙ্ক, কোয়েঙ্ক

বাঘ কাছে থাকলে হনুমানেরা খ্যাকর খ্যাকর শব্দ করে। কারণ, বাঘ ও চিতা তাদের চিরশত্রু। সকাল প্রায় ন-টার সময় বাঘ মড়ি থেকে উঠে যায়, আবার এগারোটায় তারা ঘুমিয়ে পড়ে। বাঘকে মড়ির উপর মারতে হলে সকালেই কাজ সারতে হবে। খুব তাড়া-হুড়ো না ক'রে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে, খুব ভালোভাবে নিশানা ক'রে মারতে হবে। হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য ক'রে কিংবা মাথার কাছে, গলার মাঝখানেও নিশানা ক'রে মারা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, গুলি মারার সময় যেদিকে বাঘের মুখ থাকে, গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে না গেলে, সোজা সেই দিকেই আক্রমণ করে। সেইজন্য সহজে মাথায় গুলি করা উচিত নয়। তার ওপর, ঠিক দুই চোখের মাঝখানে গুলি না লাগলে তার মগজ জখম হয় না এবং বাঘ এমন কি আধখানা মাথা নিয়েও আক্রমণ করবে।

জঙ্গলে যদি বাঘের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এবং শিকারী তৈরি না থাকেন, তাঁকে স্থির হয়ে দাঁড়িতে থাকতে হবে। দৌড় দিলেই বিপদ। মাটিতে আছাড় খেয়ে না পড়লেও অতি শীঘ্রই তাঁর নিশ্চয় বাঘের পাল্লায় পড়ার সম্ভাবনা, কারণ পিছু ফিরলেই বাঘ আক্রমণ করবে। কাছে গাছ থাকলে, বাঘের দিকে মুখ রেখে ধীরে ধীরে একটু একটু পিছু হটতে পারেন। অনেকের ধারণা, বাঘের দিকে তাকিয়ে থাকলে বাঘ সম্মোহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসল কায়দা হচ্ছে নিশ্চল হয়ে থাকা, কিংবা অতি ধীরে ধীরে বাঘের দিকে মুখ ক'রে পিছু হটে যাওয়া এবং গাছ পেলে তার আড়াল থেকে নিমেষে গুলি ছোঁড়া। ঠিক আক্রমণ করার আগে বাঘ শরীর টান ক'রে সামনের পা একটু পেছনে ঢুকিয়ে দু-তিনবার জোরে লেজ নাড়ে, ওপরে-নিচে—পাশে নয়—এবং শেষে লেজ খাড়া ক'রে আক্রমণ করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সশব্দে। শিকারী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কখনো কখনো কুড়ি ফুট পর্যন্ত কাছে এসে একটু থেমে শেষ আক্রমণ চালায়। ঠিক সেই সময়ে যদি টুপি কি জামা কি অন্য কোনো জিনিস ছুঁড়ে দেওয়া যায়, বাঘ সেটাকে

টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে শেষ আক্রমণ চালানোর আগে। এই সুযোগে শিকারী গুলি ছোঁড়বার সুবিধে পাবেন। এরূপ ক্ষেত্রে কতখানি মাথা ঠিক রাখতে হয়, অনুমান করা শক্ত। কিন্তু প্রকৃত শিকারীর কাছে এটুকু আশা করা যায়। ধীর অবিচল মানুষের স্থির লক্ষ্যের জন্য ঘাবড়ে গিয়ে বাঘ অনেক সময় শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়।

মে-জুন মাসে বাঘ জলে গা ডুবিয়ে কিংবা ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে ভালোবাসে। এক পাশে শুয়ে কিংবা উপুড় হয়ে সামনের দুই পায়ের মাঝখানে মুখ রেখে কিংবা চিত হয়ে চার পা শূন্যে তুলে ঘুমোয়। এ সময় বেশ তাক ক'রে গুলি করতে হয়। কারণ হৃৎপিণ্ড কিংবা গলার মাঝখানটা ভালোভাবে দেখা যায় না। একটু খুক ক'রে কাশলেই বাঘ যখন উঠে দাঁড়াবে তখন গুলি করা ভালো। অনেক সময় কিন্তু অপেক্ষা করা চলে না।

একবার বর্মার সীমান্তে আমার অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। গভীর বন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্জন এবং অন্যান্য গাছ ও ঝোপে ভর্তি। একপাল হনুমান এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করছে এবং মাঝে মাঝে বিরক্তি ও ভয়সূচক খ্যাকর-খ্যাকর শব্দ করছে। পালের গোদা আমার কাছ থেকে দশ হাত দূরে মাটিতে লাফাতে আরম্ভ করল। একটু এগোচ্ছে, আবার থামছে। বুঝলাম, আমাকে পেছনে পেছনে যেতে বলছে। কৌতূহলী হয়ে আমি শেষ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করলাম। নিঃশব্দে প্রায় একশো গজ গিয়ে সে তরতর ক'রে একটি বড় গাছে উঠে গেল, অর্থপূর্ণভাবে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে। সামনে ত্রিশ গজ দূরে দেখি একটা প্রকাণ্ড চিতা শুয়ে আছে চার পা শূন্যে তুলে। বনে বন্দুক তো তৈরিই থাকে। একটু কাশির শব্দ করতেই চিতাটা উঠে পড়ল আক্রমণ-ভঙ্গিতে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি তার হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে চলে গেল। বানরের যে এত বুদ্ধি আছে, অনুমান করা সহজ নয়। আমার শিকারের বেশ, টুপি ও

বন্দুক দেখে সে ধরে নিয়েছিল যে, তাদের পরম শত্রু চিতাকে আমাকে দিয়েই মারাবে। অথচ এক বিষয়ে মনে হয় তারা খুবই বোকা। গাছে হনুমান, নিচে বাঘ গর্জন করছে। সকলে যে-যার জায়-গায় আছে এবং সেখানে থাকলেই নিরাপদ। কারণ বাঘ সাধারণত গাছে উঠতে পারে না। কিন্তু বানরেরা ভয়ে ছোটাছুটি করে এক গাছ থেকে আর এক গাছে, কিংবা গর্জনের শব্দে ভয় পেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই সময় বাঘ ধরে ফেলে একটাকে। চিতা গাছে উঠতে পারে অনায়াসে, কিন্তু মগডালে তাদের ভার সয় না। বানর যদি সেখানে থাকে, চিতা ধরতে পারে না। বানর কিন্তু লাফিয়ে মাটিতে পড়ে অন্য গাছে পালিয়ে যাবার চেষ্টায়, আর তখনই চিতার হাতে মারা পড়ে। যদি দু'টি চিতা একসঙ্গে থাকে, একটি গাছের ওপরে ওঠে এবং আর একটি থাকে মাটিতে। বানরেরা ভুল ক'রে লাফালাফি করে এবং নিচের চিতা নিমেষে তাদের ধরে ফেলে। এত বুদ্ধিমান জীব, অথচ ভয়ে এমনই ভুল ক'রে মারা যায়। বাঘ ও চিতার একটি প্রিয় খাদ্য বানর। শিকারী জঙ্গলে বানরের শব্দ ও গতিবিধি দেখে বুঝতে পারবেন, বাঘ বা চিতা কত দূরে ও কোন্ দিকে আছে।

গরমকালে যখন জল শুকিয়ে যায়, বাঘ ও অন্যান্য জন্তুরা যে কয়টি জায়গায় জল জমে থাকে, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় জল খেতে যায়। যদি কাছে অনেকগুলি জলা-জায়গা থাকে, একটি ছাড়া অন্যগুলির কাছে সাদা কাপড় কি কাগজ ঝাণ্ডার সঙ্গে বেঁধে দিলে বাঘ সেদিকে যাবে না। বাঘের যাওয়ার দাগ দেখে একটি জলার কাছে প্রায় দশ গজ দূরে কুড়ি ফুট মতো উঁচু মাচা ক'রে শিকারী সূর্যাস্তের দেড় ঘণ্টা আগে বসবেন নিঃশব্দে ও নিশ্চল হয়ে। এ রকম-ভাবে শিকার বাঘ ও শুয়োরের জন্যে নিষিদ্ধ না হলেও অবাঞ্ছনীয়; মোটেই শিকারীর উপযুক্ত নয়। সেখানে কোনো এক অজানা আইনে পশু-পক্ষীরা নির্বিঘ্নে জল খায়, তাই ঠিক সেই সময় কেউই আক্রমণ করে না। শিকারী কি তাদের চেয়ে অধম হবেন? কিন্তু অনেক

সময় সুচতুর নরখাদক কি ভীষণ গোখাদক বাঘকে মারতে হলে এ-পন্থা অবলম্বন না ক'রে উপায় থাকে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জীপ গাড়ির সুবিধে নিয়ে অনেক নতুন শিকারী 'স্পট লাইট' লাগিয়ে গাড়ির ভিতরে বসেই জঙ্গলে বে-আইনীভাবে হরিণ শিকার শুরু করেছেন। যে চোখ জ্বলতে দেখেন, তাকেই গুলি করেন। জোরালো আলোতে হরিণজাতীয় জন্তুর চোখ ঝলসে যায়। এর ফলে স্বাভাবিক শিকার কমে যাওয়াতে বাঘকেও খাদ্যাভাবে হয় নরখাদক হতে হবে, কিংবা অনাহারে অকালে মরতে হবে। প্রকৃত শিকারী জীপে ক'রে জঙ্গলে যাবেন শুধু দুর্দান্ত বাঘের সন্ধানে এবং গুলি করবেন জীপ থেকে নেমে ; লক্ষ্য রাখবেন, যাতে ইঞ্জিনের ঝাঁকুনিতে গুলি মারাত্মক জায়গায় না লেগে বাঘকে সামান্য আহত ক'রে মানুষখেকো ক'রে না তোলে। হেড লাইটের পিছন থেকে গুলি মারতে হয়, না হলে শিকারীকে বাঘ দেখে ফেলে চার্জ করবে। স্পট লাইটও যেন ঐ কারণে শিকারীর গায়ে না পড়ে। যিনি স্পট লাইট ফেলবেন, তাঁর এ বিষয়ে ভুল হলে শিকারীর বিপদ। ড্রাইভারের দক্ষতার উপরও সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে।

শুক্লপক্ষের রাতে বাঘ জঙ্গলে একটু দেরিতে শিকার খুঁজতে বের হয় ; কৃষ্ণপক্ষে অন্ধকার হতেই বেরিয়ে পড়ে। রাত দশটা পর্যন্ত এবং ভোরের দিকে ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে বাঘের চলাফেরা ঘনঘন হয়। হরিণ-শুয়োরের চলাচলের পথে একপাশে বাঘ ওত্ পেতে থাকে। এইজন্য শুধু হেড লাইটে কাজ হয় না, স্পট লাইট বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কেউ কেউ লম্বা রাস্তায় গাড়িতে যেতে যেতে বাঘ দেখতে পান। কিন্তু রাস্তায় রাতে বাঘ দেখা, ও খড়ের গাদায় একটি আলপিন খুঁজে বার করা একই রকম অনিশ্চিত। জঙ্গলে স্পট লাইটে অনেক জোড়া চোখ জ্বলতে দেখা যায়। অধিকাংশই হরিণের। তাদের চোখ সাধারণত ঝাঁকি দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে কিংবা ওপরে-নিচে বড় বৃত্তাকারে ঘুরবে।

'স্পট লাইট' 'হেড লাইট' অথবা টর্চের আলোতে হরিণ কিংবা বাইসন মহিষ ইত্যাদি শিকার করা নিষিদ্ধ। ঐ আলোতে বাঘের ও চিতার চোখ প্রায় পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত লাল এবং আরও বেশি দূরে সবুজ আভাযুক্ত দেখা যায়। 'নাইটজার' পাখির চোখ ও সজারুর চোখও লাল দেখা যায়। কিন্তু তাদের চোখ থাকে অনেকটা মাটির সমতলে, বাঘের মতো অতটা উঁচুতে নয়। সাধারণত ঐ রকম আলোতে বাঘের দুই চোখই দেখা যায়। আলোতে ঝলসে গেলে বাঘ একপাশে মাথা নাড়ে ধীরে ধীরে। একটু থামে, তারপর মাথাটা নিচু হয় এবং কাঁপে। চিতা নিচু হয়ে চলে এবং সাধারণত একটি চোখই জ্বলতে দেখা যায়, ক্বচিৎ চিতার দুই চোখই জ্বলে। দুই চোখের দূরত্ব দেখে ঠিক ক'রে নিতে হবে জন্তুটি বাঘ, না চিতা। সব খবরাখবর না নিয়ে, দিনে বাঘের পাঞ্জার ছাপ না দেখে রাতে গাড়ি ক'রে ঘুরে কোনো লাভ নেই। পেট্রোলই কেবল পুড়বে।

অনেক সময় শিকারী হয়ত রাতে মড়ির ওপর মাচায় বসতে চান না। বাঘ মড়ি টেনে নিয়ে গেলে লোকাভাবে কি অন্য অসুবিধার জন্য বীট বা হাঁকাও হয়ত সম্ভব হয় না। সে সব ক্ষেত্রে শিকারী জীবন্ত টোপের ওপর মাচায় বসেন।

শতকরা আশিটি চিতা এইভাবেই মারা যায়। কিন্তু আগে জানতে হবে জঙ্গলে বাঘ বা চিতা আছে কি না, এবং টোপ বাঁধা হলে তার কাছ দিয়ে সে চলাফেরা করে কি না। চিতার জন্য ছাগলই ভালো টোপ। ছাগল যেন চেঁচাতে ওস্তাদ হয়, না হলে চিতার নজর সহজে এদিকে পড়বে না। শীতকালে ছাগলকে জলে একটু ভিজিয়ে দিলে সে একটু বেশি চেঁচায়। কালো রঙের কি শাদা ছাগলের চেয়ে বাদামী অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণের ছাগলই ভালো। কালো রঙের ছাগল অপেক্ষা শাদাই ভালো। ছাগল যেন ছোট ও সম্ভব হলে মদ্দা হয়। যে দড়ি দিয়ে হাঁটুর নিচে তাকে বাঁধা হবে সেটি শাদা কিংবা একেবারে কালো না হওয়াই ভালো। রঙ বদলাবার জন্য, দরকার হলে, নতুন দড়িতে কিছু গোবর কিংবা মাটি ঘষে দিলে ভালো হয়। মাচায়

শিকারী বসবেন বেলা চারটা নাগাদ, কারণ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চিতা এসে যেতে পারে। চিতা যদি বেশি ধূর্ত হয়, তাহলে শুধু ঐ একটি ছাগলকে এনে না বেঁধে, একপাল ছাগল ঐখানে নিয়ে একটিকে তাড়াতাড়ি খুঁটিতে কি গাছের নিচু শিকড়ে বেঁধে ফেলতে হবে। তাহলে চিতার সন্দেহ কম হবে। ছাগলটা যেন শিকারীকে দেখতে না পায়, দেখতে পেলে আর ডাকবে না। ফলে চিতা নাও আসতে পারে। ছাগল বাঁধার আগে শিকারীকে মাচায় উঠতে হবে। ছেলেবেলায় একবার ভুল ক'রে ছাগল বাঁধার পর মাচায় উঠে বসেছিলাম। খানিক পরে দেখি যে, ছাগল ঘনঘন উপরের দিকে আমাকে দেখছে এবং একটি চিতা ঐ দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে আমাকে দেখছে। বলা বাহুল্য, চিতা পালিয়ে গেল।

মাচায় নিঃশব্দে বসতে হবে। কোনো শব্দ করা কি নড়াচড়া করা চলবে না। টোপের ওপর লাফিয়ে পড়ামাত্র গুলি করতে হবে। রাত আটটার মধ্যে চিতা না এলে শিকারী ফিরে যেতে পারেন, অবশ্য খুব সতর্ক হয়ে।

গোখাদক বাঘ পালের গবাদি পশুকে আক্রমণ ক'রে জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। যদি সুবিধার অভাবে হাঁকাও করা না যায়, কিংবা মড়ির উপর শিকারী অনেক রাত পর্যন্ত বসতে না পারেন, তবে জ্যান্ত টোপের ওপর মাচায় বসা চলে। বাঘের ঘ্রাণশক্তি কম। বাঘকে জানিয়ে দেবার জন্য মহিষের বাচ্চা (বা বোদা) বাঁধা হয়। সাধারণত চরবার সময় যে রকম ঘণ্টা গরুর গলায় বাঁধা থাকে, সে রকম একটি ঘণ্টা তার গলায় বেঁধে দিতে হবে। বোদার বয়স যেন এক বছরের চেয়ে কম না হয়। গুলি করবার সুযোগ আসবে যখন বাঘ বোদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং পরে দড়ি ছিঁড়তে না পেরে সেটা খেতে শুরু করবে।

কি ক'রে মাচা তৈরি করতে হয় এবং কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা বলা যাবে এর পর, যখন মড়ির উপর মাচাতে বসার কথা লেখা হবে।

হাতিতে চড়ে শিকারের ব্যবস্থা ক'জনই বা করতে পারেন! আগে অনেক জমিদারের শিকারী-হাতি থাকত, রাজা-মহারাজাদের কথা ছেড়েই দিলাম। এখন রেশনিং-এর যুগে হাতির খোরাক যোগানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর জমিদার রাজা-মহারাজাদের দিন তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বন-বিভাগের কিছু হাতি আছে, কিন্তু সব প্রদেশে নেই। পশ্চিম বাংলার বন-বিভাগে হাতি আছে। কিন্তু শিকারী-হাতি একদিনে তৈরি হয় না। বন-বিভাগের কর্মচারীরা আজকাল শিকার করেন না, অথবা ওপরওয়ালার আদেশে শিকার করতে পারেন না; ফলে হাতিতে চড়ে শিকার করা প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। জলপাইগুড়ির চরে কয়েক বছর আগে প্রায় দশটি হাতি নিয়ে কয়েকজন শিকারী বাঘ-শিকারে বেরিয়েছিলেন। একজন পড়ে গিয়ে বাঘের হাতে মারা পড়েন। শিকারীর দল বাঘের হুংকার ও আস্ফালন দেখে ছত্রভঙ্গ। একজন বড় অফিসার তিন-চার মাস ঘুমোতেই পারেননি, সব সময়ই বাঘের সেই ভয়াল মুখ তাঁর চোখের সামনে ভাসত।

আসামে বা তরাই-এ হাতিতে চড়ে শিকার মানে 'হাওদা' শিকার। বাক্সের মতো হাওদায় বসে শিকারীর দল লাইন বেঁধে চলেন লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে। হাওদায় বেশি সংখ্যক রাইফেল নেওয়া উচিত নয়। দু'জন শিকারী এক হাওদায় থাকলেই যথেষ্ট। বাঘকে নড়তে দেখলেই গুলি ছুঁড়তে নেই। শিকারকে ভালো ক'রে দেখতে হবে আগে এবং তারপর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে হবে। গুলি না লাগলেও অনেক সময় বাঘ সশব্দে পালিয়ে যায় পুরোপুরি চার্জ না করেই। হাওদা যদি জোরে বাঁধা না থাকে, শিকারী অনেক সময় উলটে পড়ে যেতে পারেন। মাহুত ও হাতি খুবই ভালো হওয়া উচিত, না হলে বাঘের আক্রমণ সামলানো যাবে না, বিশেষ ক'রে বাঘ যখন লাফিয়ে হাতির ওপর উঠতে চেষ্টা করবে।

হাতি যদি আকারে বড় না হয়, শিকারীর পক্ষে দূরের জিনিস দেখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। শিকারী কেবল তাঁর সামনে বাঘ দেখলে

গুলি ছুঁড়বেন। নিয়ম প্রতিপালন না করলে দুর্ঘটনা হতে কতক্ষণ? বাঘ আক্রমণ করলে ভয় না পেয়ে, স্থির মস্তিষ্কে তাকে গুলি করতে হবে। অন্য কারও, অর্থাৎ মানুষের, কি হাতির গায়ে যেন গুলি না লাগে। সঙ্গে একটা ছোট কুড়ুল রাখা ভালো, যা দিয়ে ডালপালা কাটা যায়। একটা কম্বলও দরকার, যদি জঙ্গলে মৌমাছি থাকে তাহলে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়।

জঙ্গলে হাতি নিয়ে শিকার করতে হলে নিশ্চল হয়ে গাছ কি ঝোপের আড়ালে থাকতে হবে। হাতি যেন তার কান দিয়ে মাছি তাড়াবার জন্য ফটফট শব্দ না করে। বাঘের গন্ধ পেলে হাতি তীক্ষ্ণ শব্দ করে (যাকে 'বোঘারা' নেওয়া বলে) এবং কাছে বাঘ থাকলে সামনের পা ঠোকে (যাকে 'ঠোক্কর' বলে)। শিকারী এই ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র খুব সতর্ক হবেন।

যেখানে বড় ঘাস নেই এবং হাওদা দিলে গাছে ঘনঘন লাগবে, সে সব জঙ্গলে শুধু গদি এঁটে শিকার করতে হয়। অবশ্য গুলি করবার সময় দুই হাতই ব্যবহার করতে হবে। হাতি শিকারী না হলে বাঘ দেখেই দৌড় লাগাবে এবং শিকারীর তখন জীবনসংকট, কখনো মাথা গাছের ডালে লেগে ফেটে যাবে, কখনো-বা তিনি পড়েই যাবেন।

গদিতে বসে বাঘ মারা বিপজ্জনক। কিন্তু অনেক চিতা বাংলা দেশে মালদহ জেলায় এইভাবে মারা পড়েছে। কোতরালীর উদার জমিদার সাহেবের দু'টি শিকারী-হাতির পিঠে চেপে গদিতে বসে অনেক চিতা শিকার করার সুযোগ পেয়েছি।

শিকার যখন প্রথম আরম্ভ করি, তখন শুধু দু-নলা বারো বোর বন্দুক ব্যবহার করতাম। এক বন্ধুর কথামতো, চিতা মারবার জন্য এক নতুন ব্যবস্থা করা গেল। গরুর গাড়ির ছই বা ছপ্পর খুলে চার কোণে খুঁটি বেঁধে জোরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। একটা মুখ ঝাঁপ দিয়ে খুব শক্ত ক'রে বাঁধা হল এবং শিকারী ছই-এর ভিতরে ঢুকবার পর সামনের মুখটিও ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ করা হল। এই ঝাঁপে ছয় ইঞ্চি বড় একটা ফুটো রাখা হয়েছিল। সামনের দিকে দশ হাত দূরে

একটা শাদা ছাগল বাঁধা হল খুব শক্ত দড়ি দিয়ে, যাতে চিতা তাকে টেনে নিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু বিপদ দেখা দিল যখন চিতা এসে পিছনের দিকের ঝাঁপ আঁচড়াতে আরম্ভ করল তখনই। সেদিকে গুলি করবার জন্য ঝাঁপে কোনো ফুটো রাখা হয়নি। ছাপ্পর এমন ছোট যে, বন্দুক না খুলে, ঘুরিয়ে নিয়ে যে ওইদিকে নিয়ে যাব তারও কোনো উপায় নেই। বিষম বিপদ! যাক, কোনো শব্দ না শুনে চিতার সন্দেহ কমে গেল এবং সে এক লাফে ছাগলকে ধরে ফেলল। দড়ি খুবই শক্ত ছিল, তাই পরমুহূর্তে গুলি লাগালাম তার বুকে। বেচারা ছাগলকে কিন্তু বাঁচাতে পারা গেল না। পরে এইরকম শিকারে আর বসিনি। ছই যদি বড় হয় ও দুধারে যদি দুজন শিকারী থাকেন দুদিকে মুখ ক'রে, ছাগলকে বাঁচিয়ে চিতা মারা যায়।

আর একবার মড়ির ওপর বসেছিলাম, গর্ত খুঁড়ে তার ওপর গরুর গাড়ির চাকা রেখে। গর্তের দুপাশে থান ইঁট রেখে তার ওপরে চাকা রাখা হয়েছিল। কাজের সময়ে দেখি বন্দুকের নিশানা করা অসম্ভব। শুধু চিতার পা দেখা যাচ্ছিল। এরকমভাবে শিকার করার চেষ্টা করা অনুচিত। কেউ কেউ নাকি গর্তের ওপর লোহার কড়াই বা হাণ্ডা রেখে শিকারে বসেছেন। তাঁরা কেউই যে বাঘ কি চিতা মারতে পারেননি, এটা সুনিশ্চিত। প্রথমত ঠুং-ঠাং শব্দ হবে বন্দুকে কড়াই ঠেক্‌লে; দ্বিতীয়ত বাঘের পা ছাড়া অন্য কোনো অংশে ভালোভাবে গুলি লাগানো যাবে না। এ অবস্থায় গুলি করলে শিকারী নিজে না মরলেও একটি মানুষখেকো বাঘ তৈরি করবেন।

অবশ্য ছোট ঝোপের ভিতর গর্ত খুঁড়ে সামনে ভালো ক'রে ঢেকে বসা যায়। এটা কিন্তু একটু বিপজ্জনক। জঙ্গলে একবার একটা চিতা এইভাবে মেরেছিলাম। গ্রামের অনেক ছাগল, বাছুর ও কুকুর তার হাতে প্রাণ দিয়েছে, এবং গ্রামের লোক অতিষ্ঠ। মাচা করবার জন্যে গাছ যখন নেই, ঠিক করলাম গ্রামের কাছে জঙ্গলে একটি ঝোপের মধ্যেই গর্ত খুঁড়ে বসতে হবে। চারদিন আগে গর্ত করা হল তিন হাত গভীর ও দেড় হাত চওড়া। সাড়ে চারটার সময় একটা ছোট

মোড়ায় বসলাম, সামনে ছাগল বেঁধে। চিতা নিশ্চয় আসবে জানতাম, কারণ অনেক যাতায়াতের পায়ের দাগ দেখেছিলাম। একটা ছোট জলা কাছে ছিল। সূর্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে চিতা এসে গেল। ডানদিকেই বেশি পায়ের ছাপ দেখে অনুমান করেছিলাম, চিতা ঐদিক দিয়েই আসবে, কিন্তু এল বাঁ দিক থেকে। ঘ্রাণশক্তি যে কম তা বোঝাই যায়, কারণ ছুই গজ দূর দিয়ে গিয়েও আমার গন্ধ সে পেল না। ডানদিক দিয়ে এলে ছাগলকে বাঁচাতে পারতাম, কিন্তু গর্তের ভিতর বসে একটু ঘুরে যাওয়া সময়সাপেক্ষ। চিতা লাফালো টোপের ওপর, সঙ্গে সঙ্গেই গুলি। চিতা লুটিয়ে পড়ল। একটু পরে ছাগলটাও শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। আগে আমি সুনিশ্চিত ছিলাম, তাকে বাঁচাতে পারব। বাঘ কিংবা বড় প্যান্থার এভাবে মারা উচিত নয় এবং লেপার্ডের জন্য যদি এরকমভাবে বসতে হয়, আরও একজন শিকারী বন্ধুকে নিয়ে সাবধানে বসা উচিত।

মাচা থেকে শিকার

১৯৫৬ সালের আগে যদি কেউ আমায় বলত যে জঙ্গলে দু'ঘণ্টা ধরে ভূতের নাচ দেখেছে, তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতাম। ঐ বছর শেষের দিকে মধ্যপ্রদেশের খোন্দগাঁতে গিয়েছিলাম। দুপুরে খবর পেলাম যে গভীর জঙ্গলে একটা বাঘ বছর তিনেকের গরুকে মেরেছে। অন্ধকার হবার অনেক আগেই একটা বড় গাছে প্রায় পনেরো ফুট ওপরে খাটিয়া উলটে বসলাম। মাচা করবার সময় নেই। ডান দিকে ত্রিশ হাত দূরে বাদামী রঙের নধর মড়ি পড়ে রয়েছে। বাঁ দিকে বিশ হাত দূরে একটু খোলা জায়গা, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বারো হাত। চারদিকে গভীর জঙ্গল। মাঝে মাঝে নালা। খুব কাছের গ্রামটি অন্তত দেড় মাইল দূরে।

পূর্ণিমা রাত। সন্ধ্যা নেমে আসার পর দেখলাম কয়েকটা ছায়া

ঐ খোলা জায়গায় নড়ছে। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালাম। বাঘ নয়ত! না, ছায়ার টুকরোগুলি কোনো জন্তু নয়। পাতার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলোর খেলাও এ নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যে টুকরো ছায়াগুলি দু'টি মূর্তিতে পরিণত হল, একটি বালক ও অপরটি বালিকা। লম্বায় প্রায় আড়াই হাত—পরিষ্কার বস্ত্রহীন নিকষ কালো মানুষের মতো দেখতে। রাগ হল, সব বুঝি পণ্ডশ্রম হল। কিন্তু বুঝলাম, এরা মানুষ নয়। নিষ্পলক হয়ে রোমাঞ্চিত শরীরে এদের দু'জনের অপূর্ব নাচ দেখলাম প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে। পরে হঠাৎ তারা মিলিয়ে গেল বাতাসে। এই অলৌকিক দৃশ্য জীবনে ভোলবার নয়। বুঝেছিলাম যে বাঘ আর আসবে না, কারণ দূর থেকে সেও তো ঐ ছায়ামূর্তি দেখেছে। রাত দশটার পর পূর্ব-কথামতো আলো নিয়ে লোকজন এসে আমাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। যেখানে গাড়ি ছিল গেলাম। সঙ্গের শিকারী-বন্ধু ঘোষ খোন্দগাঁয়ে বাংলোতে অপেক্ষা করছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন, বোধহয় আমি গল্প বানিয়েছি, কিংবা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু বুঝলেন, বাঘের মড়ির ওপর পনেরো ফুট উঁচুতে মাচায় বসে সন্ধ্যা সাতটার সময় কেউ ঘুমিয়ে পড়ে না। তাঁকে বললাম, বাঘের জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলাম, রাইফেল তৈরি রেখে। দৃষ্টিভ্রমের কথাই ওঠে না।

আগে বলা হয়েছে কিভাবে জ্যান্ত টোপ বেঁধে শিকারী মাচায় বসেন। এখন বলা হবে মড়ির ওপর বসে মাচা থেকে শিকারের কথা। এরকম শিকারকে ছোট ক'রে দেখলে চলবে না। ধৈর্য, সতর্কতা ও নির্ভুল লক্ষ্যভেদের পরিচয় এতে পাওয়া যায়। নড়াচড়া, শব্দ করা, কথা বলা, কাশি এলে গলা পরিষ্কার করা, সিগারেট খাওয়া—সবই নিষিদ্ধ। পায়ে ঝিঁঝিঁ লাগলেও নড়তে পারা যাবে না। তার ওপর আছে শীতকালে জঙ্গলের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও অগণিত মশা।

কখনো কখনো স্বাভাবিক মড়ি, অর্থাৎ বাঘের শিকার করা গরু-মহিষ পাওয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগই বাঘের মারা বাঁধা টোপ।

নালা যেখানে জঙ্গলের পথে কি জঙ্গলের চৌরাস্তায় মিশেছে, ও বাঘের পাঞ্জার দাগ আছে, অথবা যেখানে বাঘের চলাফেরার চিহ্ন দেখা যায়, সেইসব জায়গায় টোপ বা বেট্ বাঁধতে হয়। এটা নিষ্ঠুর পদ্ধতি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নির্মম বাঘ কিংবা চিতাকে এ ছাড়া মারা শক্ত। দরিদ্র চাষী কত কষ্ট ক'রে টাকা জমিয়ে বা চড়া সুদে ধার ক'রে হয়তো একজোড়া বলদ কিনেছে, তার একটা গেলেই চাষবাস সব বন্ধ, জীবনযাত্রা অচল। আবার ধরা যাক মানুষখেকো বাঘের কথা। তাকে মারা খুবই কষ্টকর। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার পিছনে ঘুরে ঘুরে হতাশ হতে হচ্ছে এবং সেই সময়ে পর পর এ-গ্রামে কি পাশের গ্রামে মানুষ মারা পড়ছে, আর ভয়ে লোক গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে, কিংবা সব কাজকর্ম বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় কি টোপ বাঁধা খুবই অন্যায়? একটা প্রাণ দিয়ে শত প্রাণীর প্রাণ বাঁচানো কিংবা মানুষকে রক্ষা করা এক্ষেত্রে নিশ্চয় অন্যায় নয়। অবশ্য যেসব বাঘ গো-খাদক কি নরখাদক নয়, তাদের এভাবে মারা অমার্জনীয়। এ সম্বন্ধে বন-বিভাগের আইন থাকা উচিত।

যদি মাচা বাঁধবার মতো ভালো উঁচু গাছ থাকে এবং জঙ্গল থেকে ঝোপের আড়ালে আড়ালে বাঘের আসার সুবিধা থাকে, তাহলে মাচার শিকারই ভালো ; বিশেষত যদি জঙ্গল বেশি ঘন হয় কিংবা উঁচু পাহাড়ে শিকার করতে হয় কিংবা হাঁকাও করবার লোক বা বীটার না পাওয়া যায়। মাচায় বসতে হলে টোপ খুব শক্ত দড়ি কি লোহার তার দিয়ে বাঁধতে হবে। একটা শক্ত খুঁটি গভীরভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে এর জন্য। বাঁধা উচিত সামনের এক পায়ে, হাঁটুর নিচে, গলায় নয়। দড়ি নতুন হলে একটু মাটি কি গোবর দিয়ে ঘষে নিলেই চলবে। দড়িটি তার এমন শক্ত হওয়া উচিত যে বাঘ যেন ছিঁড়ে মড়ি উঠিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। এখানে জানা উচিত, যদি বীট করার জন্য টোপ বাঁধা হয়, দড়ি যেন মোটা ও শক্ত না হয়, কারণ বাঘকে তার সুবিধামতো জায়গায় মড়ি টেনে নিয়ে যেতে দিতে হয়।

টোপ যেন অস্থিচর্মসার না হয়। তাহলে বাঘ তাকে ছোঁবে না। একবার এক নৃশংস গো-খাদক বাঘকে মারবার জন্য এই রকম একটি মরণাপন্ন গরু বাঁধা হয়েছিল। সকালে গিয়ে দেখি বাঘ তার চারদিকে ঘুরেছে, কিন্তু তাকে ছোঁয়নি। এইভাবে বাঁধবার জন্য গরু গ্রামে কিনতে পাওয়া শক্ত, তবে মোষের বাচ্চা (এক বছর বয়সের বেশি ও দু' বছরের কম) বাঁধলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শিকারী যদি নিরাপদ থাকতে চান, মাচা যেন ষোলো ফুট উঁচু হয়। আমি দশ ফুটের বেশি উঁচু মাচায় থাকতে রাজী নই, কারণ মাচা যত ওপরে হবে, ততই বাঘের হৃৎপিণ্ড, ঘাড় কি গলার ঠিক-মতো জায়গায় গুলি লাগানো শক্ত হবে। বাঘের ঘ্রাণশক্তি কম, তবুও সম্ভব হলে মাচা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যে বাতাস শিকারীর দিক থেকে ঘন জঙ্গলের দিকে না যায়। ভালো হয়, যদি টোপ বাঁধবার পাঁচ-ছয় দিন আগেই মাচা তৈরি ক'রে রাখা যায়। এতে সহজে বাঘের সন্দেহ হবে না। খুব বড় মাচা কিংবা অনেক ডালপালা দিয়ে ঘিরে মাচা তৈরি করা উচিত নয়। এতে বাঘ দূর থেকেই বুঝে ফেলবে কি যেন এক নতুন জিনিসের আমদানি হয়েছে। মড়িতে আসবার সময় বাঘ ভীষণ সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ্য করতে থাকে। সন্দেহ হলে কিছুতেই আসবে না। চিতার মড়িতে রাত ন-টার পর বসবার দরকার হয় না। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চিতা এসে পড়ে। বাঘ সাধারণত আসে সাতটা থেকে ন-টার মধ্যে ; আর এই সময়ের মধ্যে না এলে আবার আসবার সময় মধ্যরাত্রিতে কিংবা ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে। কাছে জল থাকলে আরও তাড়াতাড়ি আসবে। খুব ক্ষুধা পেলে কিংবা মড়িটি গ্রাম ও লোক-জনের গোলমাল থেকে বেশ কিছু দূরে থাকলে, সূর্যাস্তের পরই আসবে। শিকারী যদি ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন, তাহলে সারা রাত থাকবার উপযোগী মাচা তৈরি করা উচিত। মাচার মাপ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পাঁচ ফুট ও সাড়ে তিন ফুট হলে ভালো হয়। মাচার লম্বা দিকটা মড়ির দিকে রাখতে হয়। অনেক সময় সারা রাতই

থাকতে হবে, বিশেষত যদি বাঘ আহত হয়, কিংবা যারা শিকারীকে নিয়ে যেতে আসবে তারা যদি ভুলে বা ভয়ে ফিরিয়ে নিতে না আসে। অনেকে গদি, কম্বল, চা ও জলের বোতল এবং মূত্র ত্যাগের জন্য রবারের বোতল রাখেন। মাচা যদি কাঠের তক্তা কি গাছের ডাল দিয়ে তৈরি হয়, বসবার জন্য এবং শব্দ বন্ধ করবার জন্য একটা চট বা সতরঞ্চি হলেও চলে যাবে। যদি বেতের মোড়ার অভাবে দড়ির খাটিয়া উলটে বসতে হয়, পা রাখবার একটু ব্যবস্থা রাখা উচিত, কারণ অল্প সময়েই পায়ে ঝিঁ ঝিঁ লেগে অবশ বোধ হতে পারে এবং শিকারী রক্ত চলাচলের জন্য তখন যদি পা নাড়বার চেষ্টা করেন খুবই ভুল করবেন। কেউ কেউ ত্রিশ ইঞ্চি চৌকো খাটিয়া (যার পায়া থাকে না) ব্যবহার করেন। এই খাটিয়া যে-নেয়ারে ছাওয়া হয় তা সবজে বা কালচে রঙের; এবং এর সঙ্গে থাকে গাছে বাঁধবার জন্য চারটে মোটা আংটা। এতে তাড়াতাড়ি মাচা বাঁধা যায়। আংটায় সুতো কি দড়ি জড়ানো থাকে, যাতে শব্দ না হয়।

জামা-কাপড় এরকম হওয়া দরকার যা থেকে খরখর শব্দ হবে না, এবং যার রঙ গাছপালার সঙ্গে মিশে থাকবে। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য, মাথা ও গলা ঢাকবার জন্য ব্যালাক্লাভা টুপি (কিংবা ফেল্ট হ্যাট ও মাফলার) এবং পাতলা উলের দস্তানা (যার ডান হাতের তর্জনী কাটা থাকবে) অতি প্রয়োজনীয়। মশা তাড়াবার জন্য হাত নাড়া নিষেধ। সুতরাং মশা তাড়ানো ক্রীম একটু মুখে লাগানো ভালো; গরমকালে হাতেও। শিকারী বেলা চারটার মধ্যে মাচায় উঠবেন। যদি বাঘ নিকটে কোথাও থাকে ও তার সন্দেহ হয়, সেজন্য অন্য চারজন লোকের সঙ্গে এসে শিকারী মাচায় উঠে পড়বেন ও অন্যেরা সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে চলে যাবে। তাহলে বাঘের মনে হবে যে সকলেই চলে গিয়েছে। শিকারী মাচায় ভালোভাবে বসে প্রথম থেকেই নিশ্চল নিস্তব্ধ থাকবেন। তাঁর মাথা যেন মাচার ওপর ডালপালার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা না যায়। মাচার তলার দিকেও কিছু পাতা হালকা

ক'রে বেঁধে দিতে হবে, যাতে নিচে থেকে নতুন কাটা ডাল কিংবা খাটিয়া বা তক্তা বোঝা না যায়। দুই পাশে ও পিছন দিকেও কিছু কিছু লতাপাতা দিয়ে একটু একটু ঢাকতে হবে, সামনে তো নিশ্চয়ই। মড়ির দিকে অর্থাৎ মাচার সামনে যেন একটি শক্ত ডাল থাকে, যেখানে রাইফেল হেলিয়ে রাখা যায় এবং শিকারের সময় যার ওপর ভর ক'রে ভালোভাবে গুলি ছোঁড়া যায়। একে ইংরেজিতে 'রেস্ট' বলে। ডালপালা টাটকা কাটলে কাটা জায়গা শাদা কি লালচে দেখায়। তাই সন্ত-কাটা জায়গায় একটু মাটি ঘষে দিতে হয়। মাচার চারধার আড়াল করার জন্যে যে লতাপাতা দেওয়া হবে তা যেন তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যায়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তা না হলে একটু পরেই রোদে তাদের রঙ শাদাটে হয়ে যাবে, অথচ অন্য পাতা দেখা যাবে সবুজ। এতে বাঘের সন্দেহ হবে। ভুল ক'রে যেন পাতা উলটো ক'রে বাঁধা না হয়। পাতার নিচের দিক যেন ওপরে না থাকে।

বেশি লোক যেন মাচা তৈরি করতে জঙ্গলে না আসে। হৈ চৈ করা বারণ। মাচা তৈরি করার জন্য ডালপালা দরকার হলে, অন্তত দু'শো আড়াইশো গজ দূর থেকে যোগাড় করা উচিত। এতে মাচার কাছে শব্দ কম হবে এবং বাঘের সন্দেহ কমবে। বাঘ হয়ত মড়ির কাছেই আছে। লতাপাতা, দড়ির টুকরো বা আর কিছু যেন মাচার নিচে পড়ে না থাকে। দেশলাইয়ের খালি বাক্স, খাবারের টুকরো, ছেঁড়া কাগজও সরিয়ে ফেলতে হবে। এসব দেখতে পেলে বাঘের সন্দেহ হবে। খালি পায়ে যেন কেউ মাচার কাছে না যায়, কারণ বাঘের ঘ্রাণশক্তি কম হতে পারে, কিন্তু একেবারে যে নেই তা বলা যায় না। ভালোভাবে মাচা থেকে দেখবার জন্য, প্রয়োজন হলে, মড়ি একটু সরিয়ে রাখতে পারা যায়। চিতা শুঁকে শুঁকে নতুন জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। বাঘের বেলায় কিন্তু দেখতে হবে যে সে যেন আগের জায়গা থেকে নতুন জায়গায় মড়ি দেখতে অসুবিধায় না পড়ে।

মাচা যেন পলকা না হয়, বা মড়মড় শব্দ না করে। লাল পিঁপড়ের বাসা কাছাকাছি যেন না থাকে। মাচায় বসবার পর মই অন্তত একশো হাত দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। দড়ির মই হলে সেটা মাচার ওপর তুলে নিতে হবে। মাচায় লাগানো থাকলে বাঘের সন্দেহ হবে।

আগের যুগে যখন টর্চলাইটের প্রচলন হয়নি তখন কিন্তু অনেকে মড়ির কিছু ওপরে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখতেন। চিতা এতে ভয় পেত না। নিজের মড়ি হলে চিতা যে খেতে আসবে তা প্রায় সুনিশ্চিত। গুলি সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার পরও চিতা মড়িতে আসতে পারে যদি শিকারী নড়ে বা শব্দ ক'রে নিজের অস্তিত্ব না জানিয়ে দেন। টর্চ না থাকলে পূর্ণিমার তিনদিন আগে ও দুদিন পরেও চাঁদের আলোতে শিকার করা অসম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে চাঁদের আলো কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আজকাল সাধারণত বন্দুকের নলে 'ক্ল্যাম্প' দিয়ে টর্চ লাগানো হয়। মাথায় হেডলাইট টর্চ বাঁধলে দেখা যাবে যে কাজের সময় আলো ঠিক জায়গায় পড়ছে না; কারণ পেশী সংকোচনের ফলে আলো সরে যেতে পারে, অথবা শিকার যদি কাছে এগিয়ে আসে কিংবা দূরে বা পাশে চলে যায়, হেডলাইটের আলো তার ওপর ঠিকমতো পড়বে না। টর্চের ব্যাটারির জন্যও ভার-বৈষম্য হতে পারে। এজন্য অনেকে একটি ছোট বাক্সে ব্যাটারি রেখে তারের সঙ্গে যোগ ক'রে শুধু টর্চটি বন্দুকের ওপর লাগিয়ে রাখেন। টর্চের আলো যেন বেশ জোরালো হয়। কারণ মড়ি থাকবে অন্তত ত্রিশ ফুট দূরে দূরে এবং মড়ির ওপর পরিষ্কারভাবে আলো পড়া দরকার। যাঁরা আরও বেশি আলো চান তাঁরা গাড়ির ব্যাটারি মাচায় রাখেন, তার লুকানো তাকে। মড়ির ওপর যাতে ঠিকভাবে এই আলো পড়ে সেজন্য আলোটা সাবধানে কোথাও বেঁধে রাখতে হবে, যেন বাঘের চোখে না পড়ে বা আগে থেকে চিকচিক না করে, অথচ দরকারমতো মাচা থেকে সুইচ টিপলেই মড়িতে খুব ভালোভাবে আলো পড়ে। বাঘ আসামাত্রই

আলো জ্বালা ঠিক নয়। কড়মড় শপশপ শব্দ থেকে যখন বোঝা যাবে বাঘ খাওয়া আরম্ভ করেছে তখনই আলো জ্বালতে হবে, আগে জ্বাললে বাঘ সম্ভবত পালাবে। একবার সব সন্দেহ এড়িয়ে যদি খাওয়া আরম্ভ করে তাহলে সে সহজে মড়ি ছেড়ে পালাবে না। অতএব শিকারী ধীরে সুস্থে ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রে গুলি করবেন। মনে রাখতে হবে যে, উঁচু থেকে নিচে গুলি করার সময় একটু সামান্য নিচে লক্ষ্য রাখতে হয়, কারণ এক্ষেত্রে গুলির একটু উঁচুতে ওঠার ঝোঁক থাকে।

খেয়াল রাখতে হবে বাঘ সাধারণত অতি সাবধানে মড়ির কাছে আসে। শুকনো পাতার সামান্য খসখস শব্দ অথবা পায়ে লেগে ছোট ডালপালা ভাঙার একটু মৃত্যু শব্দ ছাড়া বুঝতে পারা যাবে না যে সে আসছে। আসতে আসতে অনেক সময় বেশ কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাবে; তারপর মড়িতে এগিয়ে আসবে।

কখনো কখনো বাঘ আসবার আগেই শিয়াল বা হায়েনা মড়িতে আসে। শিয়াল আসে অতি ভয়ে ভয়ে। হায়েনা কাছে এসে যদি বাঘকে দেখে, কিংবা খেতে খেতে সে তার দিকে আসতে দেখলে দৌড় দেয়। কিন্তু অনেক সময় বাঘ ছোট চিতাকে মড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। শিকারী যদি ছোট টোপ বেঁধে মাচায় থাকেন, ঢিল কি ডাল অথবা গুলি হাতে ছুঁড়ে শিয়াল বা হায়েনাকে তাড়িয়ে দেবেন; নইলে তারা টোপ খেয়ে ফেলবে। হায়েনার কালো কালো ডোরা দেখে নতুন শিকারী হয়ত হঠাৎ ভাবতে পারেন যে বাঘ আসছে। কিন্তু তার চলার ধরন দেখেই তিনি নিজের ভুল ধরতে পারবেন। হায়েনার পেছনের পা সামনের পায়ের তুলনায় ছোট, এজন্য তার হাঁটার ধরন অদ্ভুত। আর মুখ ও গলাও একেবারে অন্য রকম; বাঘের সঙ্গে ভুল করার মতো একেবারেই নয়।

মাচা ভালোভাবে ও সাবধানে তৈরি না করলে অথবা শিকারী যদি নিঃশব্দে নিশ্চল হয়ে না বসেন তাঁর কি অবস্থা হতে পারে তার নমুনা একবার কয়েক বছর আগে দু' ভাই কুচবিহারে শিকার করতে

গিয়ে পেয়েছিলেন। একটি স্বাভাবিক মোষের মড়ির ওপর তাঁরা বসে ছিলেন। দূর থেকে ক্ষুধার্ত বাঘ তাঁদের দেখতে পেয়ে এমন ভীষণ গর্জন শুরু ক'রে দিল যে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকলেও অত বড় বাঘকে তাঁরা গুলি করতে সাহস পেলেন না ; ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করলেন। তখনও সন্ধ্যা হয়নি, কিছুক্ষণ পরে বাঘ চলে গেল, আর ফিরল না।

টর্চ ব্যবহার করলে একটি অতিরিক্ত বাল্‌ব সঙ্গে রাখতে হয়। ভালো টর্চ, যথা 'উইনচেস্টার' কি 'বণ্ড' না হয়ে যদি বাজারের সাধারণ সস্তা জিনিস হয়, প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গে নিভে যাবে ; প্রায়ই বাল্‌বও নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য অতিরিক্ত টর্চও রাখা দরকার। তা না থাকায় একবার আমাকে বিষম বিপদে পড়তে হয়েছিল। শীতকালে দু'দিনের ছুটিতে রাইফেল ও টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হিমালয়ের পাদদেশে। বেলা প্রায় একটার সময় জানতে পারলাম যে একটা মোষকে বাঘ জঙ্গলে মেরে পেটের খানিকটা অংশ খেয়ে চলে গিয়েছে। সেখানে পৌঁছে পাঞ্জা দেখে বুঝলাম যে দু'টি বাঘ ছিল—তার মধ্যে একটি বাঘিনী, প্রায় নয় ফুট লম্বা এবং আর একটি বাচ্চা বাঘ, প্রায় সাড়ে সাত ফুট লম্বা, অর্থাৎ প্রায় দু'তিন বছর বয়সের। কাছে উঁচু গাছ নেই। যা আছে তাতে মাত্র আট ফুট উঁচুতে মাচা বাঁধা যেতে পারে। সময় নেই, তাড়াতাড়ি চারটি কাঠের তক্তা বেঁধে চার দিক ঢেকে-ঢুকে একটা ছোট মোড়ায় বসলাম বেলা চারটের সময়। সঙ্গে ·৪২৩ রাইফেল ও ১২-বোর বন্দুক। দেড় মাইলের মধ্যে জনমানব নেই। দূরে গ্রামে হাতি থাকল। মাহুতকে বলে রাখলাম, রাত সাড়ে ন-টার সময় অথবা তার আগেই, গুলির শব্দ শুনলে, হাতি নিয়ে মাচার কাছে যেন আসে এবং দূর থেকে প্রথমে জেনে নেবে যে সে এগিয়ে আসবে কিনা।

রাইফেলে টর্চ লাগিয়ে দেখি, বাল্‌ব আগের থেকেই জ্বলে (বা ফিউজ হয়ে) গিয়েছে। একবার ভাবলাম একটু আলো তো

এখনও রয়েছে, ফিরে যাই গ্রামে। হু-হুটো বাঘ, মাচাও মোটে আট ফুট উঁচুতে, কোনো আলো নেই, রাত কৃষ্ণপক্ষের, শীত প্রচণ্ড আর অজস্র মশা। কিন্তু স্বাভাবিক মড়ি, আর হু'টো বাঘ, এমন সুযোগ সহজে আসে না। ঠিক করলাম, ফিরে যাব না। টর্চ নেই, কিন্তু দেখাই যাক না চেষ্টা ক'রে। মড়ির পেটের যে অংশটা খেয়ে গিয়েছিল সেখানটা শাদা দেখাচ্ছিল। ভাবলাম, বাঘ যদি পিঠের দিক থেকে আসে, অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাবে না এবং করবারও কিছু থাকবে না। কিন্তু যদি পেটের দিক থেকে এসে মড়িতে বসে, পেটের শাদা অংশ চাপা পড়ে যাবে। তারপর চিন্তা, কে আগে আসবে, মা না বাচ্চা। বাচ্চারা অনভিজ্ঞ ও লোভী হয় এবং বাহাত্বরি দেখাতে ছাড়ে না, অতএব সেই আগে আসবে। অনুমান ক'রে নিলাম তার হৃৎপিণ্ড কোথায় থাকতে পারে, যখন সে পেটের শাদা দিকটা ঢেকে লাফিয়ে মড়িতে বসতে আসবে। বাম হাঁটু নিশ্চল ক'রে মড়ির দিকে রাখলাম যাতে অন্ধকারে মড়ির জায়গাটা হারিয়ে না ফেলি। মনে মনে ঠিক ক'রে রাখলাম কোথায় গুলি করব, যখন পেটের শাদা অংশ হঠাৎ ঢেকে যাবে।

ওভারকোট খুলে ফেলেছি আগেই। কোট ও দস্তানাও খুলে নিলাম, যাতে গুলি ছুঁড়তে কোনো অসুবিধা না হয়। গায়ে শুধু সোয়েটার ও মাথায় ফেল্ট হ্যাট। যেমন ঠাণ্ডা আর তেমনি মশা। জঙ্গলে সন্ধ্যা নেমে আসে তাড়াতাড়ি। শীঘ্রই চারিদিক ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গেল। রাত সাতটা, এমন সময় ডান দিক, বাঁ দিক ও পেছন দিক থেকে খসখস শব্দ আসতে লাগল। সর্বনাশ, তিন নম্বর বাঘ আবার কোথা থেকে এল! পেছনে যে বিশেষ কিছু লতাপাতা দেওয়া নেই। ভাবলাম, আজই বোধ হয় আমার জীবনের শেষ রজনী। ভালো ক'রে শুনে বুঝলাম যে, পেছন দিকের শব্দ কোনো লঘু পদক্ষেপের, বাঘের নয়। বাম ও ডান হু'দিক থেকে হু'বার শব্দ হলে বুঝতে পারলাম বাঘ হু'দিক থেকে আসছে। ডান দিকের শব্দ থেমে গেল; একটু পরে বাম দিকের শব্দ একটু

থেমে গিয়ে তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। বুঝলাম বাচ্চা বাঘ আসছে। আনুমানিক জায়গায় রাইফেলের লক্ষ্য ঠিক করা ছিল। ভাগ্যক্রমে দেখলাম, মড়ির পেটের শাদা জায়গাটা ঢেকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম।

তখন রাত সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট। শব্দ নেই, গর্জন নেই; ভাবলাম, নিশ্চয় গুলি লাগেনি। কোনো শব্দ না ক'রে বা না নড়েচড়ে ১২-বোর বন্দুক ধরলাম, যদি চার্জ হয়। রাইফেলের বোল্ট ঘোরালেই শব্দ হবে, তাতেই বাঘ আমার অস্তিত্ব জানতে পারবে। তখন আর আমাকে ধরতে আট ফুট উঁচু মাচার ওপর ওঠবার জন্য লাফাবারও দরকার হবে না। এজন্য ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে রাইফেল সরিয়ে রাখলাম। জানি, অন্তত এক ঘণ্টা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থাকতে হবে, তার পরে হাতি আসবে। এর পর ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি এসে গেল জঙ্গলে। তাদের আলোতে দেখলাম, একটি বাঘ যেন পাহাড় থেকে নেমে আসছে পেছনের পা উঁচু ক'রে। ভাবলাম, এই পরিস্থিতিতে বাঘের কথা ভেবে ভেবে বাঘ দেখছি চারিদিকে। জঙ্গলে কোথাও উঁচু জায়গা নেই, দিনে দেখেছি। তখন জানি না যে বাচ্চা মরে গিয়েছে, আর বাঘিনী তাকে শুঁকে দেখছিল। মাটিতে পা না দিয়েই মাচা থেকে সোজা হাতির পিঠে নামলাম। মাহুতেরও লণ্ঠন কি দেশলাই নেই। ফিরে গেলাম বনবিভাগের বাংলোতে। পরের দিন জঙ্গলে ঢুকবার মুখেই গ্রামের লোকেরা বলল যে, ভোরে কৌতূহলী হয়ে তারা জঙ্গলে ঢুকতেই এক বিরাট বাঘিনী গর্জন ক'রে ওঠে এবং তারা ভয়ে গাছে উঠে পড়ে। গাছের ওপর থেকে তারা দেখেছে যে একটা রয়াল টাইগার মোষের ওপর মরে পড়ে আছে। সেখানে পৌঁছে বাঘিনীকে আর দেখতে পাইনি। ঠিক হৃৎপিণ্ডে গুলির আঘাত খেয়ে বাঘ মোষের পিঠেই শুয়ে আছে। গুলিটা যে লেগেছিল সেটা কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফ্লুক' বা কপালগুণে লাগা, তাই!

১৯৩৭ সালে বর্মা প্রান্তে আমার শিক্ষা হয়েছিল, কেন মাচাতে

অচেনা লোককে সঙ্গে নিতে নেই। একদিন রবিবার ভোরে খবর পেলাম যে বাঘ ছ-টা গরু মেরেছে ষোলো মাইল দূরে একটা গ্রামের কাছে জঙ্গলে। সাইকেল ছাড়া সেখানে যাবার কোনো যানবাহন নেই। কাঁচা রাস্তা। দু' মাইল সাইকেল চালিয়ে যাবার পর দেখি যে বাকি রাস্তা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড খুঁড়েছে, সাইকেল চালানো অসম্ভব। নেমে গেলাম ক্ষেতে। আল ধরে সাইকেল চালালাম ও তিনটের সময় গ্রামে পৌঁছলাম। ইউনিয়ন বোর্ডের মুসলমান প্রেসিডেণ্টের গরু মারা গিয়েছিল; তিনি বললেন, মাচা ঠিক আছে, বসলেই হয়। আরও বললেন যে জঙ্গলে রাস্তা দেখাবার জন্য একজন অসমসাহসী লোক দেবেন, সে মাচাতেও বসবে। আহমেদ নামে একটি বছর পঁচিশ বয়সের যুবক এল, তার হাতে একটি দা। এক পায়ে তিনবার ঘুরে নেচে বলল, এই দা দিয়েই শেরকে শেষ ক'রে দেব। একটু হাসলাম। চারটের মধ্যে মাচায় ওঠা গেল। মাচা তো নয়, যেন বিরাট একটা টোং, নিতান্ত পক্ষে ত্রিশ ফুট ওপরে। তাদের বোধহয় ধারণা ছিল বাঘ উড়তে পারে।

ঘণ্টা চারেক পর মড়িতে কড়মড় শব্দ। রাইফেলে লাগানো টর্চ জ্বেলে দু'টি বাঘকে গুলি করব, এমন সময় বীরপুঙ্গব আহমেদ আমার হাত টেনে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "সার, মারবেন না।" সঙ্গে সঙ্গে বাঘ পালিয়ে গেল। শিকারও শেষ। ভয়ে আহমেদের কাঁপুনি আর থামে না। রাতেই ফিরতে হবে। অন্ধকারে আল তো আর দেখা যাবে না, তাই একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা গেল। শুনলাম ডাকাতরা খবর পেয়েছে যে একজন শিকারী রাইফেল নিয়ে এসেছেন; তাই সেটা ছিনিয়ে নেবার জন্য তারা তাকে আক্রমণ করবে। আহমেদের কাণ্ড দেখে আগেই রেগে ছিলাম। ভাবলাম, একবার দেখাই যাক যদি ডাকাত শিকার করা যায়! গাড়িতে সাইকেল চাপিয়ে, তার ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে খড় চাপা দিয়ে, একটা মানুষ যেন শুয়ে আছে এই রকম ভাবে সাজিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে আমি গাড়ির একশো গজ দূরে দূরে যতদূর সম্ভব ঝোপের আড়ালে আড়ালে হেঁটে

যেতে লাগলাম, হাতে রাইফেল তৈরি। ডাকাত কিন্তু এল না। বাড়ি গিয়ে পাঁজী দেখলাম। সেদিন ছিল ত্র্যহস্পর্শ।

বী ট বা হাঁ কা শি কা র

কোন্ জঙ্গলে কোথায় বাঘ আছে, তা না জেনে শিকারে যাওয়া মানে নিষ্ফল প্রচেষ্টা। বাঘ যদি থাকে, শিকারের গণ্ডির মধ্যে তাকে নিয়ে আসতে হবে। আর তার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে টোপ বাঁধা। জ্যান্ত টোপের ওপর কিভাবে এবং মড়ি হলে কিভাবে মাচাতে বসতে হয়, আগেই সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই দু'টিই হল সন্ধ্যা এবং রাতের ব্যাপার। মড়ির ওপর বসা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর, বিশেষ ক'রে মশার উপদ্রব আর শীতকালের ঠাণ্ডার জন্য। রাতে শিকার, একা বসে থাকতে অনেকেই পারেন না। এক্ষেত্রে মড়ি হলে 'বীট' বা হাঁকা হচ্ছে উপযোগী। বীট দিনেই হয়।

সব জায়গায় সবাই হাঁকা ঠিকমতো করতে পারে না। আগেকার দিনে বিহারেই সবচেয়ে ভালো হাঁকা হতো, অন্তত আমার অভিজ্ঞতার তাই দেখেছি। এখন খুব কম জায়গাতেই হাঁকা অথবা বীট ঠিকমতো বানাতে পারে।

বীট হওয়ার আগের দিন দুপুর তিনটার মধ্যে বোদা অর্থাৎ মোষের বাচ্চা বাঁধতে হবে। সকালে তাকে চরিয়ে জল খাইয়ে আনতে হবে। যদি তিন-চারদিন উপর্যুপরি বাঁধতে হয়, তবে প্রতিদিন সকালে ন-টার পর সাবধানে গিয়ে ও চারদিক দেখে বোদাকে খুলে নিয়ে এসে খাবার, জল ইত্যাদি দিয়ে চরতে দিতে হবে। কিছু ঘাস সামনে রেখে দেওয়া ভালো। বোদার বয়স যেন এক থেকে দুই বছরের মতো হয়। ক্ষীণকায় বোদাকে বাঘ খাবে না। একেবারে ছোট হলে বাঘ তো বাঁধার জায়গাতেই খেয়ে যাবে, টেনে নেবার দরকারই হবে না এবং বাঘ কোথায় গিয়েছে জানাও যাবে না।

তাকে বের করার জন্য বীটেও কোনো ফল হবে না। বীটের জন্য টোপ বাঁধবার দড়ি যেন খুব শক্ত না হয়। বোদা যেন ছিঁড়তে না পারে, অথচ বাঘের পক্ষে ছেঁড়া বিশেষ শক্ত না হয়, এক ইঞ্চি মোটা পাটের কি শনের দড়ি হলেই চলবে। রঙ যেন শাদা না হয়, তাতে বাঘের সন্দেহ হবে। মাটি ঘষে কালচে ক'রে দিতে হবে। দড়ি যেন লম্বা না হয়। এক হাত লম্বা হলেই চলবে। এটা বাঁধতে হবে একটা মোটা গাছ কি শিকড়ের সঙ্গে। তা না হলে একটা মোটা শক্ত কাঠের খুঁটিকে ছু'হাত মাটিতে পুঁতে আর ছু'হাত মাটির বাইরে রেখে, তার সঙ্গে শক্ত ক'রে দড়ি বাঁধতে হবে। বোদার গলায় দড়ি বাঁধতে নেই; তার সামনের পায়ের হাঁটুর নিচে বাঁধা দরকার। বোদাকে একটু খোলা জায়গায় না রাখলে বা লম্বা দড়ি লাগিয়ে শুতে দিলে বাঘ তাকে দেখতে পাবে না। চার-পাঁচশো হাতের মধ্যে জল আছে, এমন জায়গাতে বোদা বাঁধা উচিত। কারণ, বাঘ শিকার ক'রে জল খেতে যাবে এবং জল যদি খুব দূরে থাকে, সে দূরে চলে যাবে এবং বীটে তাকে পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ বড় মাটির গামলায় কাছেই জল রেখে দেন। এক্ষেত্রে পাত্রটি সম্পূর্ণ মাটিতে বসিয়ে দিতে হবে, শুধু জল ওপরে থাকবে। টোপ বাঁধবার জায়গার কাছে কোনো গুহা থাকলে আগে থেকেই কাঁটা গাছ দিয়ে সেটা বন্ধ ক'রে দিতে হবে; তা না করলে বীটের সময় বাঘ সেখানে ঢুকে পড়বে। যেখানে গরু চরে বা কাঠ কাটা হয়, সে রকম জায়গাতে টোপ বাঁধতে নেই। কাছেই যেন ঘন ঝোপ থাকে, তা হলে বাঘ দিনের বেলায় ঠাণ্ডায় মড়ির কাছেই থেকে যাবে, এবং কাছে ছোট পাহাড় থাকলে বাঘ তারই নিচে ঠাণ্ডা ঝোপে দিনের বেলায় বিশ্রাম করবে। বড় নালা ও ছোট শুকনো নালার সংযোগ স্থানে, কিংবা ছু'টি জঙ্গলের পথ যেখানে এক হয়েছে বা নালার কাছে মিশেছে, এমন জায়গা পেলে ভালো। দেখতে হবে নিকটে যেন জঙ্গল থাকে এবং জলও থাকে। বোদা না পাওয়া গেলে বলদ, ঘোড়া, গাধা বা গ্রাম্য শুয়োর বাঁধলেও চলবে।

টোপ বাঁধার পরের দিন সকাল ন-টার আগে গেলে হয়ত বাঘকে মড়ির ওপরেই দেখা যাবে। যারা টোপ বাঁধবার জায়গা দেখতে যাবে তারা যেন খুব সকালে না যায় এবং অতি সন্তর্পণে দূর থেকে দেখবে যে টোপ বাঁধা আছে কি নেই। টোপ না দেখতে পেলে খুবই সতর্ক হয়ে তারা শুধু দেখবে, কোন্ দিকে মড়ি টানার দাগ আছে এবং পায়ের দাগ কার, বাঘের কি বাঘিনীর, না চিতার। বাঘিনী হলে তার বাচ্চা সঙ্গে ছিল কিনা। একেবারে মড়ির কাছে যাবার চেষ্টা করবে না। উঁচু গাছে উঠে তারা সাবধানে দেখতে পারে কোথায় মড়ি আছে। এইসব দেখার সময়ে কথা বলা কি কোনোরকম শব্দ করা নিষেধ। শুধু আস্তে আস্তে হাত নেড়ে বা চোখের ইশারায় পরস্পরকে জানাবে।

মড়ির কথা শকুনেরা জানিয়ে দেবে। বাঘ যদি মড়ি না ঢেকে রাখে কিংবা ঘন ঝোপের মধ্যে না রাখে, তাহলে শকুনের চোখ এড়াতে পারবে না। শকুন যদি গাছে থাকে ও নিচে নামতে সাহস না পায়, ধরে নিতে হবে যে মড়ি নিকটেই আছে এবং বাঘও আছে তার আশপাশে। বাঘ নিকটে থাকলে পাখিরা কিচিরমিচির ক'রে জানিয়ে দেবে। আর জঙ্গলে হনুমান থাকলে তো কথাই নেই। চিরশত্রু বাঘকে একবার দেখলেই হল। তারা রেগে খক্কর-খক্কর শব্দ ক'রে জঙ্গলের সব প্রাণীকেই জানিয়ে দেবে তার উপস্থিতির খবরটা। এইসব থেকেই জানা যায়, মড়ি কোথায় আছে এবং বাঘই বা কোথায় থাকতে পারে। ভালো হয়, যদি জলের ধারে গিয়ে পাঞ্জার দাগ দেখে আসা যায়। তাতে বোঝা যাবে জল খেয়ে বাঘ কোন্ ধার দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে।

সব চেয়ে ভালো হয় গ্রাম্য শিকারীর ওপর ভার না দিয়ে শিকারী নিজেই যদি এই সব গোড়ার জিনিস অনুসন্ধান করেন। তাঁকে নিজের হাতে রাইফেল রাখতে হবে এবং গ্রাম্য শিকারী তাঁর দু'-তিন হাত পেছনে থাকবে। কোনো শব্দ করবে না বা কথাবার্তা বলবে না। তাকেও দেখতে হবে মড়ি টানার দাগ। সব দেখা-শোনার পর

দু'জন বিশ্বস্ত লোককে গাছে রাখতে হবে। না নড়েচড়ে, না কেশে বা গল্প না ক'রে, তারা দেখবে ও শুনবে এবং বাঘের হদিশ করবে। তাদের জোরে থুথু ফেলাও চলবে না। গরুর কিংবা মোষের গাড়ি যেন চলাফেরা না করে। বাঘ বেশ ক'রে খেয়েদেয়ে, জল পান ক'রে এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়বে। বীট বা হাঁকার আগে তাকে শব্দ ক'রে জাগিয়ে দিলে বীট পণ্ডশ্রম হবে।

এবার বীট বা হাঁকার লোক একত্র করতে হবে। তারা নিঃশব্দে জড়ো হবে যেখানে মড়ি আছে, কি থাকা সম্ভব সেখান থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে (যদি বীট চারশো গজ লম্বা হয়) বা আড়াইশো গজ দূরে (যদি বীট সাড়ে সাতশো গজ পর্যন্ত লম্বা হয়)। বীট আরম্ভ হবার আগে যেন কোনো শব্দ না হয়। এর ভার একজন নির্ভরযোগ্য লোকের হাতে দিতে হবে। বীটাররা কিভাবে অগ্রসর হবে, আগেই বলে দিতে হবে। পরে টাকা দেবার সময় যেন গোলমাল না হয়। এ জন্য নম্বর ও সই দেওয়া এক-একটা কাগজ প্রত্যেক বীটারের হাতে দিয়ে বলতে হবে যে, ঐগুলি যেন তারা কাপড়ের খুঁটে বা পকেটে যত্ন ক'রে রেখে দেয়। ক্যালেণ্ডারের বড় হরফের তারিখ-গুলো কেটে কেটে দিলে শ্রম লাঘব হবে।

এখন এদের মধ্যে থেকে এমন সব বুদ্ধিমান লোকদের বেছে বার করতে হবে, যারা ঘাবড়ে যাবে না বা কেশে ফেলবে না। যদি আশী কি নব্বই জন লোক পাওয়া যায়, এই রকম বাছাই করা অন্তত চল্লিশ জন 'স্টপ' অথবা 'রোখ'-এর কাজ করবে। 'রোখ'-রাই খুব কাজ দেয়। এরা যেন খুব বৃদ্ধ বা কমবয়সী না হয়। ঘুরে ঘুরে এসে নিঃশব্দে এরা দু'ধারের গাছে চড়ে বসবে। মাচা থেকে দূরের 'স্টপ'-রা বীটের দু'ধারে সমান্তরালভাবে গাছে থাকবে। বীটের পাশে জন্তুদের যাতায়াতের পথ তাদের দেখতে হবে, যাতে বীটের প্রথম দিকেই বাঘ সেখান দিয়ে পালিয়ে না যায়। যদি স্টপ সংখ্যায় কম থাকে, সাদা কাগজ কি কাপড় সে-সব জায়গায় লাগিয়ে দিলে বাঘ ঐ পথ

ধরে পাশ কাটিয়ে যাবে না।

মাচার কাছে ছ'পাশে বারোজন 'স্টপ' থাকবে। তারা ছাড়া অন্য 'স্টপ'-রা মাঝে মাঝে শব্দ করবে এবং বাঘ তাদের দিক দিয়ে যাতে পালাতে না পারে সেজন্য গাছে লাঠি মেরে একটু শব্দ করতে পারে, হাততালি দিতে পারে বা খুব জোরে কাশতে পারে। মাচার কাছের বারোজন 'স্টপ' কিন্তু বেশি শব্দ করবে না। তাদের কাজ হচ্ছে বাঘকে ভয় না দেখিয়ে মাচার কাছে নিয়ে যাওয়া। বাঘ দেখতে পেলে তারা অল্প একটু কাশতে পারে কিংবা ছোট ডাল ভেঙে শব্দ করতে পারে, যদি সেরকম দরকার হয়। তা না হলে কিছুই করবে না, তারা আস্তে আস্তে শুধু তাদের পাগড়ি ফেলে দিতে পারে। বীট আরম্ভ হবার আগে কোনো 'স্টপ'-ই কিছু শব্দ করবে না। এ-কথা তাদের আগেই বলে দিতে হবে।

সবচেয়ে দরকার চারজন পর্যবেক্ষক। তারা মাচার পেছনে পঞ্চাশ গজ ও একশো গজ দূরে—ডাইনে ও বামে—গাছের ওপর থাকবে। তারা একবারও কোনো শব্দ করবে না। তাদের কাজ হবে শুধু দেখা, বাঘ গুলি খেয়ে অথবা আহত না হয়ে কোথায় কোন্ দিকে গেল। বীট শেষ হয়ে গেলে তারা শিকারীকে সংকেত ক'রে বলে দেবে কোন্ দিকে বাঘ চলে গেল। এর ফলে পরে অনেক সুবিধা হবে।

মাচার নিকটবর্তী ডাইনের ছয়জন ও বামের ছয়জন মাচা থেকে বিশ হাত দূরে দূরে 'রোখ' হয়ে গাছে থাকবে। তাদের কাপড় যেন একেবারে সাদা না হয়। তারা বীটের সমান্তরাল না থেকে বোতলের মুখের মতো ক্রমশ দৈর্ঘ্য ছোট ক'রে মাচার কাছে এগিয়ে আসবে; অবশ্য অনুরূপ গাছের ওপর বসে। এই বারোজনই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী 'রোখ'। এরা যেন সবচেয়ে সেরা লোক হয়। মাচা থেকে একশো কুড়ি হাতের পর ছ'ধারে চারজন ক'রে আট জন থাকবে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাত দূরে দূরে এবং তারও পর ছ'ধারে পাঁচ জন ক'রে দশজন পঞ্চাশ হাত দূরে দূরে, এর পর সত্তর হাত দূরে দূরে ছড়িয়ে

থাকবে। এদের আগেই বলে দিতে হবে কিভাবে 'স্টপে'র কাজ করতে হবে।

মাচার কাছের 'স্টপ'দের সাত-আটজন তাড়াতাড়ি মাচা তৈরি ক'রে যে-যার গাছে উঠে পড়বে। মাচার সবচেয়ে কাছে দু'পাশের বারোজন লোক ছাড়া অন্য 'স্টপ'রা বীটের লোক কাছে এসে গেলে তাদের সঙ্গে মিলে যাবে বীটারের কাজ করতে। শেষ বারোজন গাছ থেকে নামবে না।

দেখা গিয়েছে যে, বীটে জন্তুরা তাদের সাধারণ চলাফেরার রাস্তা দিয়েই বেরিয়ে যেতে চায়। বীটাররা বলবে কবে কোন্ বছর কোন্ শিকারীর কাছ দিয়ে বাঘ গিয়েছিল। বাঘ যদি আহত হয়ে পালায় পরের বীটে সে অন্য রাস্তা ধরবে, যাতে আগের মাচার রাস্তায় না যেতে হয়। এরকম পূর্বের ইতিহাস থাকলে মাচা একটু কাছে বাঁধতে হবে কিংবা একটু সরিয়ে। মাচা তৈরি করার সময় এবং বীটের গতিরেখা ঠিক করার সময় দু'টি জিনিস মনে রাখা উচিত। প্রথম, বাঘের সাধারণ চলে যাবার পথ ধরে বীট যেন হয়; দ্বিতীয়, ভালো ঝোপঝাড় থেকে খোলা জায়গার দিকে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা অনুচিত। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বীটারদের লাইন ভেদ ক'রে চলে যাবে এবং দু'-একজন বীটারের প্রাণ যাবে। সে চাইবে সব সময়ই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে।

শিকারী নিঃশব্দে মাচায় উঠে পড়বেন এবং যতক্ষণ থাকবেন যতদূর সম্ভব নড়াচড়া করবেন না। দিনের বীটের মাচা, রাতের মড়ির ওপর মাচার মতো বেশি লতাপাতা দিয়ে ঘিরে দিতে হয় না; আর 'রেস্টে' রেখে রাইফেল বা বন্দুক চালাতেও হয় না, কারণ বাঘ তো স্থিরভাবে বসে থাকবে না। সে যখন আসবে, রাইফেলের সামনের মাছিতে (যাকে ইংরেজীতে বলে 'ফোরসাইট') চোখ রেখে বাঘের ওপর তাক করতে হবে, বাঘকে দেখে তারপর মাছি তার ওপর রেখে ট্রিগার টানলে চলবে না। সঙ্গে কোনো সাথী না রাখাই ভালো। সাথীর দোষে সব পণ্ড হতে পারে, যদি-না সে-ও পাকা

শিকারী হয়। বাঘ যদি দূর থেকে মাচার দিকে তাকায়, নড়া একেবারে নিষেধ, এমন কি চোখের পাতাও ফেলা চলবে না। না নড়লে বা শব্দ না হলে বাঘ সহজে বুঝবে না যে, মানুষ মাচায় আছে। চিতার বেলায় বোধহয় এটা পুরোপুরি খাটে না। চিতা একেবারে বীটের শেষে বেরিয়ে পড়ে, অতি সন্তর্পণে, এমন কি অতি সামান্য ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে। বাঘ বীটারদের আগে আগেই চলে, যদিও কখনো কখনো সামান্য আগেই চলে আসে। বীট শুরু হলে জঙ্গলে ময়ূর থাকলে আগেই সেটি উড়ে আসবে। তারপর সাধারণত শুয়োর ও হরিণ বাঘ ও চিতার আগে বেরিয়ে পড়ে। শিকারীর মনে রাখতে হবে যে, বাঘের বীটে বাঘ ছাড়া আর কিছু মারা চলবে না! যদি আগে থেকে ঠিক করা থাকে যে মিশ্র বীট (যাকে ইংরেজীতে বলে 'মিক্সড বীট') হবে, অর্থাৎ বাঘের সঠিক খবর যদি না মেলে তখনই শুয়োর, হরিণ, চিতা মারা চলবে। যে কোনো জন্তু দেখেই যেন শিকারের নিয়ম-কানুন ভেঙে শিকারী গুলি না চালান।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে বীট আরম্ভ হবে। শুরু করার জায়গা থেকে মাচা পর্যন্ত বীট সাধারণত পাঁচশো থেকে আটশো গজ লম্বা হয়। কতখানি চওড়া হবে, সেটা ঠিক হয় জঙ্গল বুঝে ও বীটারদের সংখ্যা দেখে।

বীটারদের একজন নেতা থাকবেন, যিনি তাদের সব কাজ বুঝিয়ে দেবেন। তাঁর কাজ হবে হুইসেল দিয়ে বীট শুরু করা। বীটাররা যেন একজোট বেঁধে না চলে, বীটের প্রস্থ বরাবর তাদের ছড়িয়ে থাকতে হবে। খুব জোর দু'জন ক'রে একত্রে থাকতে পারে, অন্তত দশ হাত ফাঁকে ফাঁকে তারা চলবে এবং মাঝে মাঝে দরকার হলে বীট লীডার বা নেতা জোট ভাঙিয়ে দেবেন। বাঘের বীটে অনেকেই ভয়ে জোটে চলতে চায়। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। সঙ্গে দু'-একজন গ্রাম্য শিকারী বন্দুক নিয়ে থাকলে ভালো হয়। তাতে বীটারদের সাহস একটু বাড়ে। কিন্তু তারা বাঘ দেখলেই যেন গুলি

না করে। অবশ্য বাঘ কোনো বীটারকে আক্রমণ করলে তাকে বাঁচাতে হবে। তাদের আগে থেকে বলে দিতে হবে, বিশেষত বাঘের জন্য বীটে, গুলির আওয়াজ হলে কি করতে হবে। কাছে গাছ থাকলে বীটাররা সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠে পড়বে। গাছ না থাকলে তারা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটোছুটি না ক'রে একত্রে থাকে, বন্দুকধারী গ্রাম্য শিকারীর কাছে। বাঘ আহত হলে শিকারী মাচা থেকে একটা লম্বা হুইস্‌ল্ দেবেন। এতে বীটারদের সাবধান করা হবে যে, 'বিপদ, এগুবে না, গাছে চড়ে যাও।' আহত হয়ে মাচা থেকে দূরে চলে গেলে এবং পিছনের পর্যবেক্ষকরা সমর্থন করলে দু'বার হুইস্‌ল্ দেবেন। এতে বীটারদের জানানো হবে যে বিপদ কেটে গিয়েছে। অতএব এগিয়ে আসতে পারে। আর যদি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তা হলে তিনবার হুইস্‌ল্-এর শব্দ করতে হবে। এতে বলা হবে—'এগিয়ে এস।' অনেক সময় ঘাবড়ে গিয়ে কোনো অসতর্ক শিকারীর আঙুল ট্রিগারে লেগে গিয়ে গুলির আওয়াজ হয়ে গেলে কিংবা লোভে পড়ে বাঘের বীটে হরিণ কি শুয়োরের ওপর গুলি চালালে তাতেও তিনবার হুইস্‌ল্ দিতে হবে। বীটারদের হাতে ছোট ছোট কুড়ুল কি সড়কি থাকবে। বড় সড়কি বিপদে কাজ দেবে না।

বাঘ যেখানে আছে বলে অনুমান করা হয়, সেখান থেকে খুব কাছে বীট শুরু করতে নেই। তা হলে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে। বীটাররা প্রথমে যত জোরে পারে চেঁচাবে। এতে বাঘের ঘুম ভেঙে যাবে। এবার বীটাররা চেঁচামেচি ক'রে এগুতে আরম্ভ করবে লাঠি কি বল্লম অথবা কুড়ুল দিয়ে গাছে শব্দ ক'রে এবং ঘন ঝোপে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে। বীটের একেবারে কাছের 'স্টপ'রা নেমে পড়বে এবং বীটারদের সঙ্গে কাজ চালাবে। ধীরে ধীরে আওয়াজ তারপর কমিয়ে দিতে হবে। যখন 'বোতলের মুখের' কাছে এসে যাবে, তখন না চেঁচিয়ে শুধু কথা বলাবলি করবে ও গাছে লাঠি দিয়ে আওয়াজ করবে। বাঘকে ভয় দেখানো উদ্দেশ্য নয়। তাকে ভুলিয়ে বোতলের মুখের ভিতর দিয়ে মাচার কাছে নিয়ে যেতে

হবে। 'স্টপ'রা যদি তিন-চারবার ঠুকঠাক শব্দ ক'রে বাঘকে আটকে দেয়, তবে বাঘ ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন ক'রে বীট ভেদ করার চেষ্টা করতে পারে।

এতক্ষণ সশব্দ বীটের কথা বলা হল। ঘন জঙ্গলে কিংবা যেখানে বড় বড় গর্ত কি গভীর নালা আছে, সেখানে এই রকম বীটই কাজ দেয়। কিন্তু যদি বীটার বেশি না থাকে, সশব্দ বীট বিপজ্জনক হতে পারে ; কারণ যেখানে শব্দ কম শুনবে, সেখান দিয়েই বাঘ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। বীটারের সংখ্যা কম হলে নিঃশব্দ বীট ভালো। এ বীট কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ নয়। কারণ, বাঘের ঘুম ভাঙাবার জন্য বীট শুরু হবার সময় গাছের গায়ে বেশ কিছু শব্দ করা হয়। তারপর সাধারণভাবে কথা বলার মতো আওয়াজ ক'রে বীটাররা এগিয়ে যায়। তাদের পায়ের শব্দ ও কথা বলা ছাড়া আর কোনো গোলমাল থাকে না। বাঘ ভাববে, কাঠুরেরা বোধহয় জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছে। এতে ধীরে ধীরে তাকে 'স্টপ'দের সাহায্যে মাচার কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। বাঘের যদি আগেই বীটের অভিজ্ঞতা থাকে এবং গুলির শব্দ শোনা থাকে, অথবা আগের বীটের শিকারী মাচাতে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়ে থাকেন, তা হলে সে একাধারে খুব সতর্ক ও ভয়ংকর হয়ে ওঠে পরের বীটে। আগে যদি সশব্দ বীট হয়ে থাকে, পরে নিঃশব্দ বীট করাই ভালো। জঙ্গলে পূর্বে কি রকম বীট হয়েছে এবং কি রকম ফল পাওয়া গিয়েছে এ খবর জানা দরকার। গুলি খেয়ে বাঘ মাটিতে পড়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে ধীরভাবে আর একবার গুলি করা দরকার। চিতার বেলায় এটা অপরিহার্য, কারণ চিতা ভান ক'রে পড়ে থাকে এবং এমনও হয়েছে যে, শিকারী কাছে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন কিংবা নিহত হয়েছেন। চিতা সম্বন্ধে চলতি কথা আছে যে ছাল না ছাড়ানো পর্যন্ত চিতা মরে না। চামড়ার ক্ষতি হবে এই ভেবে যে শিকারী পুনরায় গুলি করেন না, তিনি অনর্থক নিজের বা বীটারদের জীবন বিপন্ন করেন। বাঘ ও চিতা মরবার আগে নিজের থাবা কামড়ায় বা চিবোতে থাকে এবং

শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই জিভ একটু বেরিয়ে পড়ে। ঠিক তার আগে লেজ একবার খাড়া হয়ে ওঠে। মাচা থেকে নামবার আগে ঢিল ফেলে দেখতে হবে বাঘ নড়ছে কিনা। বাঘ শিকার করবার সময় পদে পদে সাবধান হওয়া উচিত।

আগেই সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে যে মাচায় সঙ্গী নিতে নেই, বিশেষত আনাড়ী সঙ্গী। অনেক বছর আগে বিহারে ডালটনগঞ্জ থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে একবার ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম। সেই আমার প্রথম বীট শিকার। বাঘের খবর পাবার পর ঠিক হয়েছে বীট হবে। তিনটি মাচা হয়েছে—তু'পাশে তু'টি, তাতে একজন ক'রে বসেছেন, বাঘ যাতে বীট থেকে কোনোমতে বেরিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য। 'স্টপ' যেভাবে রাখা হয়েছিল, তাতে স্বভাবতই বাঘকে আসতে হবে মাঝের মাচার দিকে। সেখানে আমরা তিনজন বসলাম এক-একটি ছোট মোড়ার ওপর, বন্ধুবর মিঃ গুপ্ত, এক ডাক্তার (যিনি কখনও শিকার করেননি বা দেখেননি) ও আমি। মাচা মাটি থেকে মাত্র আট ফুট উঁচুতে। সামনের দিকে হালকা ক'রে লতাপাতা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চির ওপর। বীট আরম্ভ হল বেলা প্রায় বারোটার পর। মিনিট কুড়ি পর হঠাৎ ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মোড়া থেকে পড়ে গেলেন, অবশ্য মাচার ওপরেই। আমি ছিলাম মাচার বাঁ পাশে, ডাক্তার মাঝখানে ও গুপ্ত ডান দিকে। গুপ্ত ও আমি আমাদের রাইফেল পাশের বাঁশে ঠেকিয়ে রেখে ডাক্তারকে তুলতে গিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি কুড়ি হাত দূরে একটা বিরাট বাঘের মাথা। মাচাতে শরীরের নড়াচড়া দেখে বাঘের দৃষ্টি সেদিকে পড়েছে। আমরা অপলক-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকলাম, বিন্দুমাত্র না নড়ে, এমন কি, ডাক্তারের গায়ে যে হাত লাগিয়েছিলাম তাও না নেড়ে। তু'জনের গায়ে খাকি জামা ও খাকি টুপি। বাঘ মানুষ বলে ভাবতেই পারল না, তার নিশ্চয় মনে হয়েছিল আমরা জঙ্গলের একটি অংশবিশেষ। আমাদের অবস্থা তখন চরম! মোটে আট ফুট ওপরে আছি অস্ত্র

ত্যাগ ক'রে। সামনে বিশাল বাঘ বিশ হাত দূরে। বাঘ দাঁড়িয়েই আমাদের ধরতে পারে, লাফাতে হবে না। আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেল বোধহয় চারগুণ; মনে হল ঢাকের মতো শব্দ করছে। এই বুঝি হার্ট বেরিয়ে এল বুক থেকে! মনে হচ্ছিল, ষাট মাইল দূরে ডালটনগঞ্জের লোকেরা আমাদের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। ছু'-এক মিনিট, যাকে মনে হয়েছিল এক যুগ, আমাদের মাচার দিকে তাকিয়ে থেকে বাঘ মাচার বাঁ দিকে, অর্থাৎ আমার দিকে ফিরে চলা আরম্ভ করল। তার বুক থাকল গুপ্তর দিকে ও মাথা আমার দিকে। বাঘকে সহজে মাথায় গুলি করতে নেই, কারণ তার মগজ থাকে পিছনে এমন জায়গায়, যেখানে গুলি সহজে পৌঁছবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হলে সে চার্জ করবে সামনের দিকে অর্থাৎ গুলি লাগার ঠিক আগে যেদিকে মুখ ক'রে যাচ্ছিল। আমি পা দিয়ে গুপ্তকে ইঙ্গিত দিলাম তার পায়ে। গুপ্ত ভালো শিকারী। মুহূর্তে তিনি রাইফেল তুলে গুলি করলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থাও আমার মতো শোচনীয় ছিল। তাই তাড়াতাড়িতে ঠিক হৃৎপিণ্ডে না লেগে গুলি একটু পাশে পেটে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট গর্জন করে বাঘ লাফ দিল মাচার বাঁ দিকে, আমার দিকে, অর্থাৎ যে দিকে তার মাথা ছিল গুলি মারার পূর্ব মুহূর্তে। ভীষণ ভাবে রক্তমাখা মুখ, প্রকাণ্ড দাঁত, যেন এখনি আমার ঘাড়ে বসিয়ে দেবে। যে মুহূর্তে গুপ্ত গুলি করলেন, সেই মুহূর্তে আমিও নিজের রাইফেল নিয়ে তৈরি ছিলাম। মাচা থেকে দশ হাত দূরে, শূন্যপথে বাঘের বিশাল বুকে গুলি করলাম। '৪২৩-এর ৩৪৭ গ্রেন বুলেট কাজ দিল। বাঘ ধড়াস করে মাটিতে পড়ে গেল, মাচা থেকে মাত্র এক হাত দূরে। পাঁচ মিনিটের বেশি হতভম্ব হয়ে বসে থেকে গুপ্ত ও আমি একই সময়ে ডাক্তারকে তুলে একটি ক'রে চড় মারলাম। তিনি আগেই বাঘ দেখেছিলেন। কিছুমাত্র সংকেত না দিয়ে তিনি ভয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। মনে হল, আমাদের সেদিন পুনর্জন্ম হল।

ছু'দিন পরে আবার এক ছুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। সেখানকার

ঠাকুরাইল বা জমিদার বীটার জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর কুড়ি বছর বয়েসী ভ্রাতুষ্পুত্র নতুন ১২-বোর বন্দুক কিনেছেন, অথচ শিকারের কিছুই জানেন না। আমাদের সঙ্গে তিনি থাকতে চাইলেন ; অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতে হল। বলে দিলাম তিনি যেন শুধু দেখেন, গুলি না ছোঁড়েন। মিশ্র বীট বলে দেওয়া হল। প্রথম বীটে শুধু একটি ময়ূর এল, একটি মাচা থেকে একজন তাকে গুলি করে মারলেন। স্ফূর্তি ক'রে আমার টুপিতে দু'টি পালক গুঁজে দিলেন। তারপর দ্বিতীয় বীটের জায়গা ঠিক করতে হবে। আমি মাচা থেকে নেমে গিয়ে একটি নালা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি দ্বিতীয় বীট ঠিক করার জন্য। এমন সময় টুপিতে ছড়ছড় শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ। বুঝলাম, আমাকেই গুলি করছে। নালাতে শুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'থামো থামো।' ঠাকুরাইলের ভ্রাতুষ্পুত্রের এই কাণ্ড। ময়ূরের পালক দেখেই তিনি তাঁর বীরত্ব দেখাতে চাইলেন। ভাবলেন, এ ময়ূরটি আমি মারব না কেন? তাঁকে সকলে খুব বকাবকি করলেন। আমার টুপি খুব উঁচু ছিল বলে চার-পাঁচটি ছোট গুলির চোট লাগা ছাড়া আর কিছু হয়নি। তখনকার দিনের বিশেষ টুপি 'বাঘ মারি'ই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। পরে তাকে শাস্তি কম দিই নি। সন্ধ্যার সময় গাড়িতে সকলের বন্দুক তুলে দিয়ে আমরা একটু হাঁটতে আরম্ভ করলাম। আমি এগিয়ে গিয়ে এক গাছের ডালে উঠলাম। সঙ্গীরা একটু পিছিয়ে পড়ল, শুধু বীর শিকারী এগুতে থাকলেন। যেমনি গাছের নিচে এল, আমি ডাল থেকে লাফিয়ে পড়লাম তার ঘাড়ে, বাঘের গর্জন অনুকরণ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পতন ও মূর্ছা।

আহত বাঘের অনুসরণ

পায়ে হেঁটে আহত বাঘের পিছু পিছু যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক। কিন্তু প্রকৃত শিকারী প্রাণপণ চেষ্টা করবেন আহত বাঘকে মারবার জন্য। শখের শিকারী যাঁরা রাত্রে গাড়ি থেকে চোখ দেখেই গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যান, তাঁরা অবশ্য শিকারী পদবাচ্য নন। তাঁদের কথা আলাদা। অধিকাংশ জায়গাতেই হাতি নেই, সেখানে পায়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এইরকমভাবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অনেক শিকারীকে প্রাণও দিতে হয়। কোনো আহত প্রাণী তিলে তিলে মরবে, চিন্তা করাই কষ্টকর। আর যদি বাঘ গুলি খেয়েও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ক'রে বেঁচে ওঠে, সে হিংস্র নরখাদক হয়ে উঠবে। সে বন্য জন্তু শিকার করতে পারবে না, দৌড়ে ধরতে পারবে না, কিংবা ধরলেও দাঁত দিয়ে বা পা দিয়ে শিকারকে চেপে রাখতে পারবে না।

অনেক মানুষের জীবনহানি করার পর যে সব নরখাদক বাঘ বা চিতা মারা পড়েছে, ছাল ছাড়াবার সময় দেখা গেছে, তাদের অনেকের গায়ে গাদা বন্দুকের গুলি বা ছররার আঘাত চিহ্ন আছে, হয়ত গুলি ভিতরে রয়ে গিয়েছে। কোনো বাঘের একটি পা জখম, কারও চোয়াল ভেঙে গিয়েছে, কিংবা একটা চোখ নষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে বাঘ যে মানুষ মারবে, আশ্চর্য কি! সাধারণত সে মানুষকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় সে ক্ষেপে ওঠে। মানুষ মারা যে কত সহজ ও মানুষ যে কত অসহায় ছ'-একবার চেষ্টা করার পরই সে তা বুঝতে পারে। মানুষের রক্তে লবণ থাকায় মানুষ খুবই প্রিয় শিকার হয়ে পড়ে। মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই তখন আর বাঘের ভালো লাগে না। একটা আহত বাঘ ভয়ংকর মানুষ-খেকোতে পরিণত হয়।

আহত বাঘকে অনুসরণ ক'রে মারতে হলে সবচেয়ে দরকার সাবধানতা, অপূর্ব সতর্কতা ও শিকার-দক্ষতা। হঠকারিতার জন্য কত শিকারীকে বিপদে পড়তে হয়, এমন কি প্রাণও দিতে হয়।

আহত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আহত বাঘের পেছনে যেতে নেই, কারণ অন্তত তিন-চার ঘণ্টা পার না হলে তার আক্রমণ করার ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকে। তাই নিয়ম হচ্ছে একটু দেরি করা, দেখা, ভাবা, পেছনে যদি 'স্টপ' বা পর্যবেক্ষক থাকে তাদের জিজ্ঞাসা করা এবং গ্রাম্য শিকারীদের কাছে খবর নেওয়া, পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন্ দিকে ও কোথায় কোথায় জল আছে।

গুলি লাগার তিন-চার ঘণ্টা পরে রক্তপাতের জন্য বাঘ একটু কাবু হয়ে পড়বে ও তার পেশীতে জড়তা আসবে। আর যদি বিকালের দিকে আহত হয়, পরের দিন সকালের আগে অন্ধকারের মধ্যে তাকে খুঁজতে যাওয়া বিপজ্জনক।

কয়েক বছর আগে বিহারে এক ডেপুটি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটু ভুলের জন্য জীবন দিতে বসেছিলেন। দু'টি মাচা হয়েছে। একটিতে সস্ত্রীক তিনি, অপরটিতে সস্ত্রীক আর এক শিকারী, যাঁর নাম ধরা যাক গুপ্ত। বীটে বাঘ বেরিয়ে এল এবং তিনি গুলি করলেন। বাঘ গুলি খেয়ে পালিয়ে গেল।

ডেপুটি কমিশনার হলে কি হয়, তিনি শিকারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বাহাদুরি তো নিতে হবে। এইজন্যে তাড়াতাড়ি মাচা থেকে নেমে পড়লেন। গুপ্ত বারবার তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। গুপ্তর কথা না শুনে অনভিজ্ঞ শিকারী যেমনি একটা নালা পার হয়েছেন, বাঘ তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ে সারা শরীরটা ধরে কামড়াতে আরম্ভ করল। তিনি ক্ষুদ্রকায় লোক, বৃথা চেষ্টা করলেন কোমর থেকে রিভলভার বার করতে। তাঁর স্ত্রী মাচা থেকে সব দেখছিলেন ও আর্তনাদ করছিলেন। যেচে আনা বিপদ থেকে ঐ একগুঁয়ে অবাধ্য লোকটিকে বাঁচাবার জন্যে এবার গুপ্ত এগিয়ে গেলেন অতি সন্তর্পণে। তিনি একজন বিচক্ষণ শিকারী। যতদূর সম্ভব কাছে গিয়ে মানুষকে এড়িয়ে বাঘকে গুলি ক'রে মেরে ফেললেন। ভাগ্যক্রমে বাঘ আগেই ভালো-ভাবে আহত হয়েছিল, এজন্য শিকারীকে প্রাণে মারতে পারেনি। ভদ্রলোক ছয় মাস হাসপাতালে চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হন।

আহত বাঘকে খুঁজে বার করতে হলে দু'টো জিনিস জানতে হবে, বাঘের শরীরের কোন্ অংশে গুলি লেগেছে এবং সে কোন্ দিকে চলে গিয়েছে। শিকারী যদি বাঘের মাথায় গুলি ক'রে থাকেন ও তা সত্ত্বেও সে যদি চলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে মাথার ঘিলু কি মস্তিষ্ক নষ্ট হয়নি। মাথায় গুলি লেগে সঙ্গে সঙ্গে না পড়ে গেলে যতই সময় যাবে, ততই আঘাতের গুরুত্ব ও যন্ত্রণা কমে যাবে ও বাঘ আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়ে থাকবে। এমন কি হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগার পরও দেখা গিয়েছে যে, বাঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দৌড়ে গিয়েছে, তারপরে অবশ্য মরেছে। এরই মধ্যে কিন্তু সে মানুষ মেরে ফেলতে পারে। থাবাতে কি পায়ের নিচের দিকে গুলি লাগলে তিন পায়ে ভীষণ জোরে দৌড়ে আক্রমণ করতে বাঘের কষ্ট হয় না। পায়ের ওপর দিকে লাগলে জোরে চার্জ করতে পারে না। ঘাড়ের ভিতরে বা মেরুদণ্ডে গুলির আঘাত পেলে সে আক্রমণ করতে পারবে না। পেটে গুলি লাগলে বাঘের আক্রমণ করার ক্ষমতা চলে যায় না। কোনোও আঘাত যদি সামান্য হয়, পুরা একদিন পর দেখামাত্র বাঘ আক্রমণ করে না, কিন্তু আঘাত গুরুতর হলে ক্রুদ্ধ বাঘ দেখামাত্র চার্জ করবে।

মনে রাখা দরকার যে, অনেক সময় আহত বাঘ গর্জন না করেই, শুধু শব্দ শুনেই অনুসরণকারী শিকারীকে আক্রমণ করে। বেশি রক্ত পড়লেই মনে করা উচিত নয় যে, বাঘ শীঘ্র মারা পড়বে। পেশীতে গুলি লাগলে রক্ত বেশি পড়ে। মারাত্মক আঘাতে বেশির ভাগ সময় শরীরের ভিতরেই রক্তক্ষরণ হয়। রক্ত থেকে বোঝা যায় কোথায় গুলি লেগেছে। পেটের গুলিতে রক্ত বেশি পড়ে না, যেটুকু রক্ত পড়ে তা-ও পাতলা। ফুসফুসে গুলি লেগে থাকলে গাঢ় রক্তে প্রায়ই ফেনা থাকবে। কখনোও কখনোও থাকবে চাপ রক্তের ডেলা। ঘাসে ও গাছের পাতায় রক্ত দেখে বোঝা যাবে শরীরের কোন্ অংশে, ওপরে না নিচে, আঘাত লেগেছে। যে পথে বাঘ গিয়েছে তার দু' ধারে রক্ত দেখলে বুঝতে হবে যে গুলি শরীর ভেদ করে গিয়েছে। রাস্তায়

কোনাকুনিভাবে রক্ত থাকলে অনুমান করতে হবে যে, পায়ে আঘাত লেগেছে। পেছনের পা যদি রক্ত মাড়িয়ে থাকে, বুঝতে হবে শরীরের সামনের দিকে আঘাত হয়েছে। পা ভেঙে থাকলে বরাবর টানার দাগ থাকবে।

এখন রক্ত দেখে ও পায়ের ছাপ (পাঞ্জা) দেখে তাকে অনুসরণ করতে হবে। যদি জানা যায় যে বাঘ কোথায় আছে, তাহলে কাজ অনেকটা সোজা হয়ে যায়। প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোককে গাছে চড়িয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে হবে। তারপর দু'জন বিশ্বাসী লোক ও দু'জন সন্ধানী গ্রাম্য শিকারী (যারা পায়ের চিহ্ন দেখতে যাবে) নিয়ে একজনকে দশ-পনরো গজ দূরের গাছে চড়াতে হবে। শিকারী অবশ্য দেখবেন যে, বাঘ যেন তখন তাকে আক্রমণ না করে। সে গাছ থেকে যদি ইঙ্গিতে বলে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না, আর একজন লোককে দশ-পনরো গজ দূরের আর একটা গাছে উঠতে হবে। সে-ও যদি ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে বাঘ নেই, পাঁচ-সাত গজ দূরে আর একজন লোক গাছে উঠবে এবং সে যদি ইশারায় জানায় যে বাঘ দেখা যাচ্ছে কিংবা কিছু নড়ছে, শিকারীকে গাছে চড়ে ভালোভাবে বসে দেখে গুলি করতে হবে। বাঘকে না দেখে শুধু গাছপালা কি ঘাস নড়ছে দেখে গুলি করা উচিত নয়। মনে থাকে যেন, কোনো কথাবার্তা বলা চলবে না, শুধু সংকেত ক'রে জানাতে হবে।

বাঘ কোথায় আছে না জানতে পারলে একটু বেশি কষ্ট করতে হবে ও বিপদও বাড়বে। গুলি খেয়ে বাঘ জলের ধারে, ঝোপের কাছে যাবার চেষ্টা করবে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে রাইফেল তৈরি রেখে যেতে হবে। যদি দেখা যায়, বাঘ জলের সন্ধানে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে, তা হলে বোঝা যাবে যে চোট খুব মারাত্মক হয়নি। যদি জলের ধারে যাবার চেষ্টা না ক'রে থাকে, গুলিতে ভীষণ জখম হয়েছে মনে করা অন্যায় হবে না। দু'জন গ্রাম্য শিকারী ও দু'জন সন্ধানী ('ট্র্যাকার') নিয়ে নিঃশব্দে, অতি সাবধানে শিকারী এগিয়ে যাবেন ধীরে ধীরে। শিকারী নিজে বাঘের পদচিহ্ন অনুসরণ করবেন না।

তিনি সঙ্গের লোকেদের চেয়ে একটু এগিয়ে থাকবেন, তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য। শিকারীর নজর থাকবে সামনের ঝোপ-জঙ্গলের ওপর, সেখানে কোনোও কিছু নড়ছে কি-না দেখবেন।

হনুমান কি পাখিরা অনেক খবর দেবে। হরিণ যদি এক দৃষ্টে কোনো দিকে তাকিয়ে থাকে, সে কি দেখছে জানা দরকার। নালা পার হবার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে। আহত বাঘ প্রায়ই নালার ওপর দিয়ে যায়, সুতরাং নালা পার হবার আগে নালার ওপরের দু'ধারে ঢিল ফেলা উচিত। নালার ভিতর দিয়ে যাবার চেষ্টা না করাই ভালো। সাধারণত বাঘ দরকার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে কিংবা নিচু থেকে ওপরে আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু আহত হলে সে সহজে নিচে থেকে পাহাড়ের ওপরে আক্রমণ করবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে বাঘ নদী পার হতে চেষ্টা করেনি। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, আঘাত গুরুতর। আর যদি জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে কি বসে থাকে, বাঘের অবস্থা খুবই কাহিল বুঝতে হবে। শেষ কথা যেন মনে থাকে—আহত বাঘ যদি আক্রমণ করে, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে, ধীরে ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রে তাকে গুলি করতে হবে এবং দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়তে হবে বাঘ খুব কাছে এসে পড়লে।

এমন যদি হয় যে, পায়ে হেঁটে এগুতে পারা যাচ্ছে না, একদল মোষ ও তার সঙ্গে ছয়-সাতজন রাখাল জোগাড় করতে হবে। শিকারী মাঝখানে থাকবেন এবং ঠিক তাঁর পেছনে গ্রাম্য শিকারী দু'জন। বাঘ দেখে বা বাঘের গন্ধে মোষরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে পারে, তখন তাদের সামলানো দায় হবে। হয়ত শিকারীকেই আক্রমণ ক'রে বসবে। বাঘও সেই সুযোগে পাশের কি পেছনের রাখালকে হয়তো আক্রমণ করবে। ধীরভাবে শিকারীকে তখন গুলি ছুঁড়তে হবে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, বাঘ দেখে পুরুষ-মোষরা বাঘকে আক্রমণ ক'রে শিং দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে।

মোষের দল না পাওয়া গেলে সম্ভব হলে কুকুরের সাহায্য নেবেন। গ্রামের কুকুর মাঝে মাঝে ভালো শিকারী হয়। আদিবাসীদের কুকুর এ বিষয়ে ওস্তাদ, কারণ তারা শিকার করতে অভ্যস্ত। কুকুরেরা বাঘের অবস্থান নির্দেশ ক'রে দেবে, ঘেউ ঘেউ শব্দ ক'রে বাঘকে বিরক্ত করবে। শিকারীর দিকে নজর না দিয়ে বাঘ তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে শিকারী সাবধানে গুলি করার সুবিধে পাবেন।

এত করেও যদি আহত বাঘের খবর না পাওয়া যায়, সন্ধান পাবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা ক'রে দেওয়া ভালো। তাতে লোকে উৎসাহ নিয়ে সাহায্য করবে আহত বাঘকে মারতে।

পরিশিষ্ট—(ক)

বাঘের জঙ্গলে শিকারী কখনো কখনো হাতি, মোষ, গণ্ডার, ভালুক কি বরাহ অর্থাৎ বুনো শুয়োরের সামনেও পড়তে পারেন। মারাত্মকভাবে গুলি কোথায় লাগাতে হয়, জেনে রাখা ভালো।

হাতির মস্তিষ্ক থাকে মাথার পিছনে নিচের দিকে। সহজে ওখানে গুলি করা যায় না। তার মাথার সামনের হাড় কোথাও কোথাও নয় ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু। হাতি যখন মানুষ মারবার জন্য তৈরি হয়ে আক্রমণ করে, তার শুঁড় বুকের সামনে এবং অগ্রভাগ ভিতরের দিকে সামনের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। কখনো কখনো শুঁড় মাথার সামনে পাকানো থাকে, কখনো বা ধরবার জন্য সামনের দিকে সোজা লম্বাভাবে প্রসারিত থাকতে পারে। মাথা ভালোভাবে দেখা গেলে মারাত্মক গুলি মারবার প্রধান জায়গা হচ্ছে মাথায়, দুই চোখের মাঝখানের দুই ইঞ্চি ওপরে, যেখানে ডিমের মতো একটু খোঁদল আছে। এটা হচ্ছে ছোট স্ফীত স্থানের (যাকে ইংরেজিতে বলে 'বাম্প') ঠিক উপরিভাগে। দ্বিতীয় মারাত্মক জায়গা হচ্ছে কপালের পাশে অর্থাৎ রগ, চোয়াল ও গলার সন্ধি-স্থানের কাছে। তৃতীয় মারাত্মক গুলি যায় এক কানের ভিতর দিয়ে আর এক কানে। চতুর্থ জায়গা হচ্ছে শুঁড়ের ভিত্তিভূমির (অর্থাৎ 'বেস্'-এর) ভিতর দিয়ে মুখে, এতে অন্তত আক্রমণ থামানো যাবে। পঞ্চম জায়গা হৃৎপিণ্ড, কিন্তু অন্য জন্তুদের তুলনায় এটা থাকে নিচের দিকে—একটু অগ্রভাগে, সেইজন্য এবং অনেক মাংস ও চর্বির স্তর থাকে বলে গুলি মারার পক্ষে খুব নির্ভরযোগ্য জায়গা নয়। অন্য কোনো উপায় না থাকলে হাতির সামনের দুই পায়ে হাঁটুতে গুলি ক'রে তাকে থামাতে হবে।

একদল হাতি যদি শিকারীর দিকে দৌড়ে আসে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, মোটে নড়তে নেই। হয়তো তারা দু'পাশ দিয়ে চলে যাবে। যদি হাতির কাছ থেকে দৌড়ে পালাতেই হয়,

উঁচু জায়গা থেকে নিচুতে যাওয়া উচিত ; নিচু থেকে উঁচুতে নয়। টুপি, জামা বা অন্য কিছু সামনে ফেলে দিলে, হাতি যখন সেটা ছিন্নভিন্ন করে, সেই অল্প সময়ের মধ্যে, খুব বড় গাছে উঠতে পারলে প্রাণ বাঁচবে। শেষ চার্জ করার সময় হাতি প্রথমবারের মতো তীক্ষ্ণ চিৎকার প্রায়ই করে না।

হাতির দৃষ্টিশক্তি প্রখর নয়, কিন্তু শ্রবণশক্তি বেশ ভালো এবং ঘ্রাণশক্তি অত্যধিক ভালো। যূথভ্রষ্ট দাঁতলা হাতি, এবং কোনো কোনো দন্তবিহীন পুরুষ-হাতি বা 'মাকনা' ভয়ংকর শয়তান। দলপতি দাঁতলা হাতি সাধারণত সামনের দিকে থাকে না। বোধহয় তাকে বাঁচাবার জন্যেই একটা বয়স্কা মাদী-হাতি সামনে থেকে সাধারণত দলপতির কাজ ক'রে থাকে।

জেনে রাখা ভালো, পুরুষ-হাতির সামনের পায়ের ব্যাস সাধারণত ষোলো থেকে বিশ ইঞ্চি হয়, মাদী-হাতির চৌদ্দ থেকে ষোলো ইঞ্চি। ব্যাসকে ৬২ দিয়ে গুণ করলে পরিধির দু'গুণ মাপ পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে হাতির মাটি থেকে কাঁধের উচ্চতা।

মোষ সাধারণত আহত না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু গুলি লাগলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করবে ; হয় শিকারীর প্রাণ নেবে কিংবা নিজের প্রাণ দেবে। আহত মোষ প্রায়ই ঘুরে গিয়ে শিকারীর গন্ধ অনুসরণ ক'রে পিছন থেকে আক্রমণ করে। শিকারী গাছে উঠে পড়লে গাছের তলায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহারা দেবে। এত দুর্দান্ত, ধূর্ত, প্রতিহিংসাপরায়ণ যে সে চলে যাবার ভান ক'রে একটু আড়ালে যায় এবং শিকারী যেমনি গাছ থেকে নামে, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে তাকে আক্রমণ করে।

একে মারবার সবচেয়ে মারাত্মক নিশানা স্থান হচ্ছে ঘাড়। এই জায়গাটি ভালোভাবে না পাওয়া গেলে, গুলি যদি পাঁজরার কোনাকুনি গিয়ে অপরদিকের ঘাড়ের দিকে যায়, তা হলেও খুব কাজ দেয়। মোষ শিকারীর একেবারে সামনে থাকলে বুকের মাঝ-

খানে, সামনের ছু' পায়ের মধ্যে গুলি লাগলেও মারাত্মক হবে, কিন্তু মরতে দেরি হতে পারে। শিকারী খুবই সুদক্ষ হলে, নির্ভুলভাবে গুলি মারার মতো হাত থাকলে, দুই চোখের মাঝখানে গুলি মারবেন। মাঝখান থেকে সামান্য একটু নিচে হলেই ভালো, ওপরে নয় ; কারণ, শিকারীকে আক্রমণ করার সময় মোষ মাথা সম্পূর্ণ না তুলে নাক তুলে দেখে। যে ছু'টি উঁচু জায়গা থেকে ছু'দিকের শিং বেরিয়েছে, একেবারে ঠিক তাদের মাঝখানে গুলি লাগলে চলে ; একটু এদিক-ওদিক হলেই তাকে আটকানো যাবে না। কানের ঠিক পেছনে গুলি মারলেও কাজ দেবে। নাকের ছু'টি ছিদ্রের একটু ওপরে, ঠিক মাঝখানে গুলি লাগলে মোষ কাবু হয়ে পড়বে। শেষের চার রকম পদ্ধতিতে গুলি ছুঁড়তে হলে প্রকৃষ্ট লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা থাকা দরকার। মনে রাখতে হবে, মোষের নাক ও চোখ খুবই প্রখর, কানও কম যায় না।

গণ্ডারের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি প্রখর, দৃষ্টিশক্তি ভালো নয়। আহত না হয়ে যদি আক্রমণ করে, চটপটে লোকের পক্ষে তার সামনে থেকে পাশে সরে যাওয়া খুব শক্ত নয়। কিন্তু আহত হলে ঘুরে এসে বাতাসে মানুষের গন্ধ ভালো ক'রে শুঁকে আবার আক্রমণ করবে। গলার মাঝখানে গুলি মারা সবচেয়ে কার্যকর। একটি চোখ ও কানের মাঝখানে গুলি মারলেও খুব ভালো কাজ দেয়। সামনের ছু' পায়ের মধ্যে বুকের ঠিক মাঝখানে, কিংবা পাশ থেকে বুকের ঠিক মাঝখানে—একটু ওপরে হলেই ভালো—গুলি কার্যকর হবে। ঘাড়ে গুলি মেরেও গণ্ডারকে থামানো যায়।

ল্যাজ উঁচু ক'রে দৌড় দিলে প্রায় সবক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, গণ্ডার চার্জ করার জন্য ছুটে আসছে না। আক্রমণ করার সময় সাধারণত ল্যাজ উঁচু থাকে না।

গণ্ডার একই জায়গায় মলত্যাগ করে। এতেই তার বিপদ। কারণ, লাইসেন্সবিহীন শিকারী বুঝে ফেলে কোথায় তাকে পাওয়া

যাবে। গণ্ডার সংরক্ষিত জন্তু, কিন্তু তার শিং (খড়্গ) চোরাবাজারে প্রায় দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। কুসংস্কারবশে এটা কোনো কোনো ব্যাধি আরোগ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গিয়েছে যে, এই রকম কোনো গুণ এর বিন্দুমাত্র নেই। তবুও অনেক গণ্ডার বে-আইনিভাবে 'পোচার'-দের হাতে প্রতি বছর নিহত হয়ে চলেছে।

লালচে রঙের ভালুক সাত হাজার থেকে এগারো হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ে থাকে। হিমালয়ের কালো ভালুক, কি তার চেয়ে ছোট সমতলবাসী 'শ্লথ' ভালুকের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল। চারশো-পাঁচশো গজ দূর থেকে মানুষের গন্ধ পায়। লালচে রঙের ভালুকের সামনের পায়ের চিহ্নতে গোড়ালি ও আঙুলের তলার তালু ছাড়া-ছাড়ি থাকে, কিন্তু পেছনের পায়ে এমন ফাঁক থাকে না। হিমালয়ের কালো ভালুক কিংবা সমতলবাসী ছোট কালো 'শ্লথ' ভালুকের পায়ের ছাপ দেখে মনে হবে যে, খালি পায়ে একটি বালক হেঁটে গিয়েছে; তাতে ওপর ও নিচের ভাগে কোনো ফাঁক থাকে না। এরা ক্ষুধার্ত হলে গরু-ছাগল মারে। ভালুক সাধারণত গুহাতে থাকে। খুব সকালে যখন গুহাতে ফেরে কিংবা বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন সে গুহা হতে বেরিয়ে আসে, শিকারী যেন বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকেন।

সকাল ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত কিংবা বিকাল চারটা থেকে সারা রাত এরা সাধারণত খাবার খুঁজে বেড়ায়। এরা মাঝে মাঝে মাংস খায় এবং শিকারকে জ্যান্ত থাকতেই খেতে আরম্ভ করে, বন্য কুকুরেরা যেমন ক'রে থাকে। ভালুক গাছে উঠতে পারে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পারে না; নামবার সময় মাথা ওপর দিকে থাকে। এরা প্রথমে আক্রমণ করার সময় চারটি পায়েই আসে। তখন সুবিধা-মতো ঠিক গলার মাঝখানে কি ঘাড়ের মাঝখানে, কি একটু পেছনে গুলি মারতে হয়। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ভালুকের শরীরের

লোম স্থানবিশেষে পাঁচ ইঞ্চি থেকে নয় ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। গুলি যেন শুধু লোমেই না লাগে। কাছে এসে পড়লে প্রায় পনেরো ফুট দূর হতে দু'পায়ে ভর ক'রে চার্জ করে। তখন তার বুকের মাঝখানে ঘোড়ার নালের মতো সাদা দাগ দেখা যায়। তার মাঝামাঝি গুলি মারতে হবে, এটি মর্মস্থান। ভালুক ওপরে থাকলে সহজে গুলি মারা উচিত নয়, কারণ একেবারে মরে না গেলে সে ঝড়ের মতো নেমে এসে আক্রমণ চালাবে। সঙ্গে অস্ত্র না থাকলে টুপি কি জামা কিছু ফেলে জোরে পালালে, ভালুক সেটা যখন ছিঁড়বে, গাছে উঠে পড়ে কি জোরে দৌড় দিলে চটপটে লোক বেঁচে যেতে পারে।

দাঁতলা শুয়োর, অর্থাৎ বন্য বরাহ আহত হলে ভীষণভাবে চার্জ করে; আহত মোষের চেয়ে তা কম নয়। গাছে, কি একটু উঁচু জায়গায় উঠে গেলে এর হাত থেকে বাঁচা যায়। অনেকের ধারণা যে, শুয়োর একবার যেদিকে যায় সেদিক থেকে আর ফেরে না; এটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তীরবেগে পেছনের পায়ে ঘুরে এরা চার্জ করতে পারে। এদের মারতে হলে গলার মাঝখানে গুলি করতে হবে, না হলে হৃৎপিণ্ডে।

প রি শি ষ্ট—(খ)

দেশে আজকাল ভালো নতুন রাইফেল, বা ১২-বোর বন্দুক পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না। গুলি যোগাড় করা তো আরো দুষ্কর, যা গুলি পাওয়া যাবে তা-ও পুরনো এবং সামনাসামনি বাঘ শিকারের সময় বিপদ ডেকে আনবে। কারণ হয়তো সে-গুলি ফুটবেই না অথবা দশ-বিশ গজ দূরে মাটির ঢেলার মতো এসে পড়বে। ১২-বোরের লীথল কি 'কণ্ট্র্যাকটাইল' বুলেটও দুষ্প্রাপ্য। পাওয়া গেলেও টাটকা হবে না এবং দুর্মূল্য। এক্ষেত্রে কোনো বিশ্বাসী ভদ্রলোক বা দোকানদারের কাছ থেকে ব্যবহৃত অর্থাৎ পুরনো রাইফেল কি বন্দুক কিনতে হয়। ব্যারেলের ভিতরটা ভালো ক'রে দেখতে হবে, যেন বেশি ক্ষয়ে গিয়ে না থাকে, কিংবা মরচে পড়ে ছোট ছোট গর্তে ভরতি না থাকে। প্রায় সব শহরেই পুলিসদের গুলি ছোড়ার জন্য 'রেঞ্জ' বা লক্ষ্যভেদ কেন্দ্র থাকে। কলকাতার কোনো কোনো বন্দুক বিক্রেতা দোকান-দারের এই প্রকার রেঞ্জ আছে। সেখানে কিংবা গভীর জঙ্গলে রাইফেলে গুলি চালিয়ে দেখতে হবে যে, একশো গজ দূরের লক্ষ্যস্থলে গুলি ঠিক পড়ে কি-না। বাঘ প্রভৃতি সংকটজনক শিকারে গুলি ঠিক না চললে যে-কোনো মুহূর্তে শিকারীর প্রাণ যেতে পারে।

এসব শিকারে এক-নলার চেয়ে দু'-নলা রাইফেলই ভালো, কারণ কাঁধ থেকে না নামিয়েই তাড়াতাড়ি দু'টি গুলি উপর্যুপরি চালানো যায়। এক-নলা রাইফেল যতই ভালো হোক না কেন, দ্বিতীয় গুলি ছোড়ার সময় বোল্ট ঘোরাবার শব্দে জানোয়ার জেনে যাবে যে শিকারী কোথায়! তাছাড়া ছুঁড়তে দেরিও হবে। দুই-নলাতে গুলি আটকে যাবার (অর্থাৎ জ্যামিং হবার) সম্ভাবনাও কম। এক-নলার সুবিধা হচ্ছে যে এটা সস্তা, জঙ্গলে ঘোরবার পক্ষে হালকা এবং জানোয়ারের দলের, যথা হাতির দলের, সামনে এসে গেলে অন্তত পাঁচটা গুলি পর-পর পাওয়া যায়। সম্ভব হলে দু'-নলা রাইফেলই (এবং ১২-বোর বন্দুক) ব্যবহার করা উচিত।

জঙ্গলে 'ঘোড়াওয়ালা' (হ্যামার) বন্দুক ব্যবহার করা বিপজ্জনক। লতায় জড়িয়ে ঘোড়া বা হ্যামার উঠে গিয়ে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। এতে নিজের যত বিপদ, সঙ্গী-সাথীদের ততোধিক। শুধু তাই নয়, শিকারী হয়ত গুলি ছোড়বার জন্য ঘোড়া তুলেছেন; কিন্তু শিকার সরে গেল। এ অবস্থায় ঘোড়া আবার নামিয়ে রাখতে হবে। অতি সাবধানে, আস্তে আস্তে টিপে এ-কাজটি না করলে গুলি বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু ঘোড়াবিহীন অর্থাৎ 'হ্যামার-লেস' বন্দুকে এটা অনেক সোজা। শুধু সেফটি ক্যাচ্ নামালেই হবে। লতায় লেগে হ্যামার পড়ে যাবার সম্ভাবনাও নেই। কেউ কেউ ভাবেন যে, ঘোড়াওয়ালা বন্দুকই জঙ্গলে ভালো। এটাও ভুল ধারণা। কয়েক বছর আগে ঝিনাইদহ (বাংলাদেশ) মহকুমাতে নলডাঙ্গা জঙ্গলে চিতার জন্য বীটের ব্যবস্থা করা গেল। বন্ধুবর সেন ও আমি কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম। সেখানকার স্কুলের এক শিক্ষক ও আরও তিনজন স্থানীয় শিকারী ভদ্রলোক আমাদের দলে যোগ দিলেন। শেষোক্ত চারজনের ঘোড়াওয়ালা বন্দুক, আমাদের দু'জনের 'হ্যামারলেস'। বীট আরম্ভ হবার আগে চায়ের টেবিলে, কি ধরনের বন্দুক ভালো এই নিয়ে প্রশ্ন উঠল। স্থানীয় চারজন দৃঢ়ভাবে বললেন যে, ঘোড়াওয়ালা বন্দুকই জঙ্গলে প্রশস্ত। ভোটে আমাদের দু'জনের পরাজয় হল। কিন্তু অনতিবিলম্বে আমাদের প্রশ্নের যে সঠিক উত্তর পেয়ে যাব তা কল্পনাতীত ছিল। মাচা করা গেল না, সময় অল্প। গাছের আড়ালে থাকা ঠিক হল। প্রথমে আমি, তারপরে সেন, শিক্ষক মহোদয় ও পরপর তিনজন স্থানীয় ভদ্রলোক— এইভাবে গাছের তলায় ছোট ছোট ঝোপের আড়ালে থাকা হবে সাব্যস্ত হল। সেন অভিজ্ঞ শিকারী, ভারতবর্ষ ও বর্মায় অনেক বড় বড় শিকার করেছেন। তিনি বললেন, চিতার চার্জ মাটিতে দাঁড়িয়ে নিতে তিনি রাজী নন। একটি মই দিয়ে তাঁকে গাছের ওপর তুলে দেওয়া হল। শিক্ষক বললেন, তিনি চিতাকে ভয় করেন না, অনেক বাঘ মেরেছেন, অতএব মাটিতেই থাকবেন। কিছুক্ষণ পরেই বীট

আরম্ভ হল। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুম্ ক'রে বন্দুকের আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার কানে এল—'আমাকে বাঁচাও।'

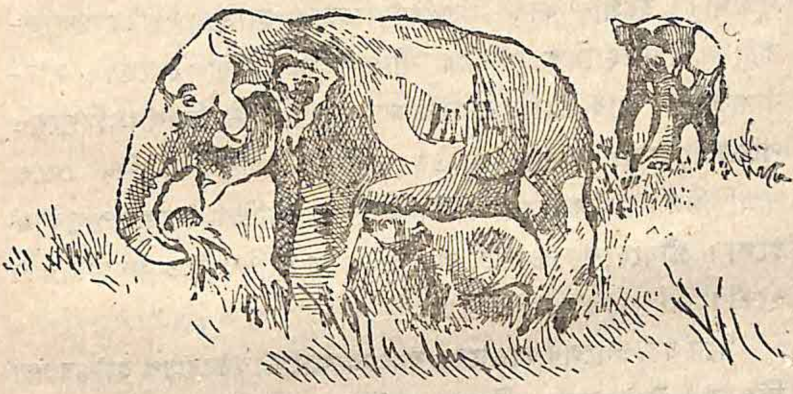
ভাবলাম, গুলি খেয়ে চিতা তাঁকে আক্রমণ করেছে। সেনকে গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমিই নিকটে, অতএব আমাকেই যেতে হবে সাহায্য করতে। ভীষণ বেতবন, কাঁটাতে আমার হাত ও পা রক্তাক্ত হয়ে গেল, শুধু হাফ সার্ট ও হাফ প্যাণ্ট ছিল পরনে। ছুটে গিয়ে দেখি যে শিক্ষক গাছের তলায়, হাত রক্তে মাখা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাঘ কোথায়?'

তিনি বললেন যে বীট আরম্ভ হওয়ার পর একটু ভয় হয়েছিল, তাই বন্দুক নিয়ে গাছে চড়বার চেষ্টা করেন। বন্দুকে গুলি ভরা ছিল, গাছের ডালে লেগে ঘোড়া উঠে আবার পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে গেল। তাঁর হাত ছিল বন্দুকের নলের ঠিক ওপরে। প্রথম তিনটি আঙুল ও হাতের তালুর অর্ধেক একেবারে থেঁতলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কবজি ও কনুইতে খুব শক্ত ক'রে রুমাল বেঁধে রক্ত বন্ধ করলাম। জঙ্গলের পাঁচ মাইল দূরে থেকে এক ডাক্তারকে ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা গেল। তারপর ঝিনাইদহ হাসপাতালে গেলাম; কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেনে তাঁকে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে এসে ভর্তি করা হল। তিন মাস অসম্ভব ভুগে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেন, কিন্তু তিনটি আঙুল ও অর্ধেক তালু চিরজীবনের মতো গেল। কে চেয়েছিল এ রকম মর্মান্তিক প্রশ্নোত্তর?

বাঘ শিকারের জন্য সাধারণত চারশো গ্রেন ভারি বুলেট দরকার। বাঘের মতো পাতলা চামড়ার জন্তুর জন্য 'সফ্ট' অর্থাৎ সীসার নরম গুলি ব্যবহার করতে হয়। ভালুক ও বুনো শুয়োরের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু হাতি কি মোষ, বাইসন, গণ্ডারকে মারতে হয় 'হার্ড' বুলেটে। এ সব শিকারের পক্ষে রাইফেলের বোর ৪৫০/৪০০, ৪৬৫, ৪৭০, ৩৭৫-ম্যাগনাম হলেই ভালো—অন্ততপক্ষে ৪২৩। কিন্তু শিকারী সুদক্ষ না হলে রাইফেল বা বন্দুক দিয়ে কি হবে! মাচা থেকে ত্রিশ গজের মধ্যে

বাঘ বা চিতা মারতে ১২-বোর বন্দুক প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যায়। কিন্তু লীথল বা কনট্র্যাক্‌টাইল কি রোটাক্স 'সফ্‌ট্' গুলি, যাই ব্যবহার হবে, তা যেন তাজা হয়। ১২-বোরের গুলির ওজন বেশি, কিন্তু ধাক্কা দেবার ক্ষমতা অনেক কম, সেইজন্য একেবারে মারাত্মক স্থানে গুলি না লাগলে শিকারকে রোখা যাবে না। এক্ষেত্রে সহজেই বোঝা যায় যে, পায়ে দাঁড়িয়ে মারলে কি অবস্থা হবে! প্রথমেই এল-জি বা এস-এস-জি মাচা থেকে কখনোও ব্যবহার করতে নেই। মাটিতে চার্জ করলে ঐ সব ছোট গুলি সময় সময় হয়তো আক্রমণ থামাবে, বিশেষত চিতার, কিন্তু বাঘের বেলায় চার্জ থামাতে এল-জি বা এস-এস-জি সব সময় কাজ দেবে না। আহত বাঘকে অনুসরণ করার সময় রাইফেলই ভালো, কিন্তু শিকারী একটু কাঁচা হলে ও রাইফেল-শিকারে পারদশা না হলে ১২-বোর বন্দুক ব্যবহার করতে পারেন 'সফ্‌ট্' বুলেট ভরে। এল-জি কাজ দিতে পারে।

জঙ্গলে ঢুকলে রাইফেল বা বন্দুক নিজের হাতে এমনভাবে নিতে হবে যে, মুহূর্তের মধ্যে যেন গুলি ছোড়া যায়। রাইফেল তাক করার সময় শিকারীকে মনে রাখতে হবে যে, আলো কম থাকলে কিংবা জমি যদি সমতল হয়, তাহলে পাল্লা অর্থাৎ দূরত্ব আসলের চেয়ে বেশি মনে হয়। পরিষ্কার আলোতে কিংবা উপত্যকা কি জলের ওপারে লক্ষ্যবস্তু থাকলে মনে হয় পাল্লা আসলের চেয়ে কম দূরবর্তী। রাইফেলের পাল্লা ঐভাবে ঠিক করা দরকার।



হাতি …

আগে ছিল একদল অতিকায় প্রাণী। ম্যামথ। দশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগেকার এই ম্যামথরাই হাতির পূর্বপুরুষ। প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনায় তারা মারা পড়ে।

হাতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় আজকের নয়। ভারতে আর মিশরে এই পরিচয়ের প্রমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোতে হাতির দাঁতের কাজ-করা প্রাগৈতিহাসিক কালের সীলমোহর পাওয়া গেছে। সার-বাঁধা হাতি আর ছোট একটি মানুষ। এমনি নিদর্শন মিশরেও পাওয়া গেছে। এদেশে হাতির দাঁতের কারুশিল্প বহুদিন থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। চীন-দেশে প্রাচীনকালেও হাতির দাঁতের সূক্ষ্মকাজ হতো। গ্রীসদেশের ভাস্কর্যে অনেক ক্ষেত্রে হাতির দাঁত ব্যবহার করা হতো।

মনে হয়, আলেকজাণ্ডারের সময়ের আগে ইউরোপে হাতির চল ছিল না। খ্রীষ্টের জন্মের তিনশো ছাব্বিশ বছর আগে পুরুরাজার সঙ্গে যুদ্ধে হস্তিবাহিনী দেখে গোড়ায় গ্রীক সৈন্যেরা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য তারা মাহুতকে মেরে হস্তিবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিতে পেরেছিল।

এরপর খ্রীষ্টের জন্মের দুশো আশি বছর আগে এপিরাসের রাজা পিরাস হস্তিবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ক'রে প্রথম রোমের সৈন্যদের হারিয়ে দেন। তারও তেষট্টি বছর পরে কার্থেজ থেকে হ্যানিবল সসৈন্যে আল্পস্ পাহাড় ডিঙিয়ে হাতি নিয়ে গিয়ে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়েছিলেন।

পরে কার্থেজকে হারিয়ে রোম এই পরাজয়ের শোধ নিল। এরপর রোম প্রথম শুরু করল হাতি নিয়ে প্যারেড। তারপর শুরু হল হাতির লড়াই, ষাঁড়ে-হাতিতে যুদ্ধ, হাতির পায়ের তলায় কুমারী

মেয়েদের ছুঁড়ে দেওয়ার নিষ্ঠুর পৈশাচিক তামাশা। পরে এ থেকেই হয় সার্কাসের গোড়াপত্তন।

ইংলণ্ডে জুলিয়াস সীজার যখন হাতি নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন, ব্রিটনদের মধ্যে তখন মহাত্রাসের সৃষ্টি হয়। এরপর ইউরোপ থেকে যুদ্ধে হাতির ব্যবহার উঠে যায়।

হাতিকে কি ক'রে পোষ মানাতে হয়, আফ্রিকার লোকে আগে তা জানত—কিন্তু চর্চার অভাবে পরে তা ভুলে যায়। আধুনিক আমলে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড এই লুপ্তবিদ্যা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু উদ্যম আর অধ্যবসায়ের অভাবে সে কাজ বেশি দূর এগোয়নি। আজও দেখা যায়, ইউরোপ-আমেরিকার যাবতীয় সার্কাসে ভারতীয় হাতিরই প্রায় একাধিপত্য।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এখনকার হাতি দু' রকমের—ভারতীয় আর আফ্রিকী। আফ্রিকার হাতির কুলোর মতো বড় কান; তাদের শুঁড় দেখে মনে হয় যেন ভাগ-ভাগ করা। পিঠের সবচেয়ে উঁচু জায়গা হয় কাঁধের কিংবা ল্যাজের কাছাকাছি। পা লম্বা, মাথা বড়, মুখ লম্বাটে। ভারতীয় হাতির কান ছোট; একটু ত্রিভুজাকৃতি। শুঁড় ভাগ-ভাগ করা নয়। পিঠ একেবারে সোজা কিংবা খিলানের মতো সামান্য একটু উঁচু। পা একটু ছোট; মুখও তাই। ভারতীয় হাতি কিছুটা ঠাণ্ডা প্রকৃতির এবং বুদ্ধিমান। তাকে সহজে পোষ মানানো এবং শেখানো যায়। আফ্রিকার হাতি উচ্চতায় ভারতীয় হাতির চেয়ে প্রায় ফুটখানেক বড় হয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল আফ্রিকায় স্ত্রী-হাতিরও দাঁত হয়; কিন্তু ভারতীয় স্ত্রী-হাতির দাঁত থাকে না বললেই হয়।

সিংহলে পুরুষ-হাতির মধ্যে শতকরা প্রায় একটির দাঁত থাকে। আসামে এবং তার উত্তরে বা পুবে প্রায় অর্ধেক পুরুষ-হাতির দাঁত থাকে না; কিন্তু ভারতবর্ষে অন্যান্য পঞ্চাশটির মধ্যে একটির দাঁত নেই।

কোনো কোনো হাতির মাত্র একটি ক'রে বড় দাঁত থাকে; তাকে

বলা হয় 'গণেশ'। এক দাঁত থাকলে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনেক সুবিধে হয়। আফ্রিকায় একটি হাতির পাঁচটি দাঁত এক ধারে, আর চারটি দাঁত অন্য ধারে দেখা গিয়েছিল। আবার একদিকে আটটি এবং অন্য দিকে সাধারণ একটি দাঁত থাকতেও দেখা গেছে। বর্মায় কখনোও কখনোও হাতির আখের ধরনের কোঁচকানো দাঁত দেখা যায়। তাকে বলা হয় 'কিয়ানজীৎ' বা হাতির রাজা। আফ্রিকার হাতির দাঁতের রেকর্ড হচ্ছে লম্বায় এককেটি বারো ফুট এবং একজোড়া দাঁতের ওজন পাঁচ মন তিরিশ সের। এশিয়াতে হাতির দাঁতের রেকর্ড হচ্ছে লম্বায় সাত ফুট দেড় ইঞ্চি আর তার বেড় বিশ ইঞ্চি।

উড়িষ্যার তালচরের রাজা একটি হাতি মেরেছিলেন। তার হু'টো দাঁতের একটির ওজন ছিল দেড় মন এবং আরকটির এক মন সতেরো সের। এক মন বা তার বেশি হলে দাঁতের ওজন ভালো বলতে হবে। উচ্চতায় ভারতীয় পুরুষ-হাতি সাড়ে নয় ফুট হলে এবং স্ত্রী-হাতি সাড়ে আট ফুট হলে খুবই ভালো। আফ্রিকাতেও এখন এগারো ফুট উঁচু হাতি হুষ্প্রাপ্য। উচ্চতায় আফ্রিকার পুরুষ-হাতি সাড়ে নয় ফুট এবং স্ত্রী-হাতি নয় ফুট হলে বেশ ভালো বলা হয়।

হাতির শরীরে সবচেয়ে দেখবার মতো জিনিস তার শুঁড়। তার নাক আর ওপর দিকের ঠোঁট একাকারে বেড়ে গিয়ে হয়েছে শুঁড়। নিচের ঠোঁট ত্রিভুজাকৃতি—নরম থলথলে। শুঁড়ের ডগায় হু'টি নাকের মতন আছে। মানুষের হাতের মতো এই শুঁড়টি এত কাজ দেয় যে, পালিশ করা জায়গা থেকেও পয়সা তুলে নিতে পারে। বিশ্রাম করার সময় শুঁড় একেবারে মাটিতে ঠেকে যায়। সময় সময় শুঁড়ে আর পায়ে সাপের কামড়ে হাতির জীবনান্ত হয়। হাতির সবচেয়ে দরকারী এই অঙ্গটি নষ্ট হয়ে গেলে তার পক্ষে বাঁচা দায় হয়। শুঁড় দিয়ে হাতি জল টেনে মুখে দেয়। শুঁড়ে চোট লাগলে একটু গভীর জলে গিয়ে হাতি মুখ দিয়ে জল খায়।

শুঁড় দিয়ে গাছের ডাল তুলে এরা মশা-মাছি তাড়ায়, গা

চুলকানোর জন্যে ছোট ডাল ব্যবহার করে ; সেটা ঠিক জায়গায় না পৌঁছুলে একটু বড় ডাল তুলে গা চুলকে নেয়। শুঁড় দিয়েই এরা গায়ে জল কিংবা ধুলো ছিটিয়ে নেয়, খাবার তুলে মুখে দেয়। সন্দেহ হ'লে শুঁড় দিয়ে দেখে নেয় মাটিতে তার ভার সইবে কিনা ; শুঁড় দিয়েই জঙ্গলের গন্ধও নেয়। আদর করতে সে যেমন শুঁড় বুলোয়, তেমনি আবার শুঁড় দিয়েই সে বিশাল বাঘকেও অনায়াসে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চার্জ করার সময় শুঁড় মাথায় গুটিয়ে রাখে এবং ঠিক সময়ে এক আঘাতে শত্রুর মাথা ভেঙে দেয়।

হাতির মগজ মানুষের মগজের চেয়ে আট গুণ বড়। বানর, কুকুর আর ঘোড়ার চেয়ে এদের বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয়।

হাতির সামনের পায়ে পাঁচটি ক'রে আর পিছনের পায়ে চারটি ক'রে নখ আছে। পায়ের ছাপ এক-এক হাতির এক-এক রকম। কারো নখ স্পষ্ট, কারো বা গোড়ালি ; কোনোটা থ্যাবড়া, কোনোটা পরিষ্কার গোল। দেখে বোঝা যায়, কোন্ পায়ের ছাপ কোন্ হাতির। জঙ্গলে এইভাবে গুণ্ডা বা খুনে হাতি খুঁজে বার করতে হয়। অনেক হাঁটতে হয় বলে এবং কাঁটা বা পাথরকুচি ফুটে এদের পায়ে অনেক সময় ব্যথা হয়। চলাফেরার সুবিধের জন্যে সুস্থ সবল হাতিদের পায়ের নখের মধ্যে তৈলাক্ত গ্রন্থি থাকে। সামনের দু'টি পায়ের হাঁটু মাটি থেকে সামান্য একটু ওপরে থাকে বলে এরা ঘোড়ার মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। হাঁটু সামনের দিকে মুড়তে পারে। ভীষণ জোরে লাথিও চালাতে পারে। সার্কাসে ফুটবলও খেলে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে কিংবা পেটের ব্যথায় হাতি যদি একবার মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে তার মরে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। বর্মায় মাহুতরা এ অবস্থায় তাদের চোখে লঙ্কার জল দেয়, যাতে লঙ্কার জ্বালার ঠেলায় সে চট ক'রে উঠে পড়ে। সাধারণত ছয় ফুট অন্তর এরা পা ফেলে। পাঁচ ফুট বাঁধ কি ছয় ফুট পরিখা এরা পার হতে পারে না। কিন্তু অসীম সাহসে পা টিপে টিপে এরা অবলীলাক্রমে খাড়া পাহাড়ে উঠে যায়। তেমনি উঁচু জায়গা থেকে নামেও

পা টিপে টিপে। দূরপাল্লার পথ ঘণ্টায় আড়াই মাইল বেগে আর দশ-পনেরো মাইল রাস্তা ঘণ্টায় চার-পাঁচ মাইল বেগে চলতে পারে। চার্জ করার সময় তার গতিবেগ হয় ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল। অবশ্য এই গতিবেগে তার দম বেশিক্ষণ থাকে না।

হাতির ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর। বাতাস অনুকূল থাকলে শুঁড়টি সাবমেরিনের 'পেরিস্কোপের' মতো ওপরে তুলে তারা এক মাইলেরও বেশি দূর থেকে মানুষের গন্ধ পায়। অনেক দূর থেকে জলেরও সন্ধান পায়। ঘ্রাণশক্তির জোরেই এরা রাস্তায় অজগর বা অন্য জানোয়ার এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে।

হাতির দৃষ্টিশক্তির চেয়ে শ্রবণশক্তি ভালো। অনেক দূর থেকে তারা শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু শব্দটা কিসের সেটা আগে থেকে সঠিক ধরতে পারে না।

হাতির কান প্রায় সব সময় নড়ে। কোথাও সন্দেহজনক কিছু ঘটলে কান ঘাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে। নিবিষ্ট চিত্তে কিছু শোনার দরকার হলে কান সামনের দিকে এগিয়ে আনে। জোয়ান বয়সে কানের ওপরটা টান-টান থাকে; বয়স হয়ে গেলে কুঁচকে যায়। কানের কাছটা স্পর্শকাতর বলে মাহুত তার পায়ের আঙুল ছুঁইয়ে পোষা হাতিকে ডাইনে বা বাঁয়ে চালিয়ে নেয়।

হাতির দৃষ্টিশক্তি প্রখর নয়। মনে হয়, সে তার একেবারে সামনের জিনিস ভালো দেখতে পায় না। মাথা তুলে দেখতে হয় বলে কোনো জিনিস একটু দূরে না থাকলে সে ঠাহর পায় না। তার ফলে, আগে থেকে গন্ধে টের না পেলে হাতি না দেখতে পেয়ে অন্য জন্তুর ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে।

জঙ্গলে হাতি থাকে দল বেঁধে; এক-এক দলে তিরিশ-চল্লিশ কিংবা তারও বেশি। তারা চলেও সবাই দল বেঁধে। বলিষ্ঠ প্রবীণ দাঁতলা হাতি যূথপতি বটে, কিন্তু আসল দলপতি হচ্ছে বয়স্কা বিশালকায়া বুদ্ধিমতী স্ত্রী-হাতি। যূথপতিকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে

তাকে আর অন্য দাঁতলাদের রাখা হয় দলের ঠিক মাঝখানে—বন-জঙ্গলের কাছ ঘেঁষে। স্ত্রী-হাতি আর বাচ্চা হাতির দল আগে আগে চলে; পালাবার সময় যূথপতি আর দাঁতলারা সবার আগে দ্রুতবেগে সরে যায়; স্ত্রী-হাতিরা যায় সকলের পিছনে পিছনে। বিপদের মুখোমুখি হয় দলপতি স্ত্রী-হাতি; দরকার হলে সে-ই শত্রুকে সোজা আক্রমণ করে।

'মাক্‌না' অর্থাৎ দাঁত নেই এমন প্রবল-পরাক্রম পুরুষ-হাতিকে আসাম অঞ্চলে কখনো কখনো যূথপতি হতে দেখা গেছে।

একদল হাতি কখনোও অন্য দলের সঙ্গে বরাবরের মতো মিশে যায় না। একদলের বন্য স্ত্রী-হাতিকে অন্য দল গ্রহণ করবে না। পুরুষ হাতি কিন্তু অতি সহজেই অন্যদের দলভুক্ত হয়ে যায়। মানুষের পোষা স্ত্রী-হাতি পালিয়ে এলে হাতির দলে স্থান পাবে।

দলে সাধারণত কোনো অশান্তি হয় না; কারণ, মিলেমিশে থাকা হাতিদের স্বভাব। দলে কার কী জায়গা সবাই জানে। দলের কেউ মাথা গরম ক'রে ফেললে বাকি সবাই নিজ গুণে তাকে ক্ষমা করে। কদাচিৎ দলপতিত্বের জন্যে ভীষণ লড়াই হয়। কেউ কখনোও আহত হলে কিংবা মাটিতে পড়ো-পড়ো হলে অন্যেরা তাকে দু'পাশ থেকে ঠেকিয়ে রেখে, পিছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে চলে। আবার পালাবার মুখে কেউ যদি শিকারীর গুলিতে আহত হয়, পরে বিপদ কেটে গেলে দলপতি তাকে দেখবার জন্যে ফিরে আসে। কেউ গর্তে পড়ে গেলে তাকে সাহায্য করবার জন্যে অন্যান্য হাতিরা এগিয়ে আসে। মানুষের হাতে বন্দী হলে দলের হাতিকে মুক্ত করবার জন্যে অনেক সময় বহুদূর থেকে যূথপতিকে ফিরে আসতে দেখা গেছে।

হাতিরা যে বিপদে-আপদে কিভাবে পরস্পরকে দেখে, তা বোঝা যায় বাচ্চা হওয়ার সময়। পাছে বাঘ বাচ্চাকে আক্রমণ করে তার জন্যে দিনের পর দিন হাতির বাচ্চাকে দল পাহারা দেয়। জন্মের পরেও তিন-চারদিন পর্যন্ত তারা কাছাকাছি থাকে এবং জঙ্গলে

চলাচল শুরু করে না। তারপরেও খুব ধীরে ধীরে চলে, যাতে বাচ্চার কি মা'র অসুবিধা না হয়।

অত বড় শরীরটা রাখবার জন্যে হাতিকে রোজ অন্তত ছয় মণ ডালপালা খেতে হয়। পুরো হজম হয় না বলে তাদের লাদ দিয়ে সারের কাজ হয় না; কিন্তু তাতে তার্পিন তেল মিশিয়ে শুকনো জ্বালানি ক'রে জঙ্গলে মশা তাড়ানো যায়। বর্ষাকালে পাহাড়ের কাছাকাছি জঙ্গলে এরা সাধারণত বাঁশ খেয়ে দিন কাটায়; পরে সমতলক্ষেত্রে নেমে এসে বাঁশের চেয়ে ঘাস আর সবুজ ডালপালার ওপর বেশি নির্ভর করে।

প্রতিদিন হাতির খেতে সময় চলে যায় প্রায় আঠারো থেকে বিশ ঘণ্টা। হাতি জাবর কাটে না। দুপুরের গরমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করে। বেশি গরমে হাতির কষ্ট হয়; শীতে ভালোই থাকে। খুব গরমের দিনে অনেক সময় তারা মাথার উপর গাছপালা লতা-পাতা ছড়িয়ে রাখে। বিকেলে নদী-নালা-বিলে এরা স্নান করে। ফূর্তি ক'রে জল খায়, শুঁড় দিয়ে নিজের গায়ে জল দেয়, অন্যের গায়েও জল ছিটোয়। হাতি স্বচ্ছন্দে জলে ভাসতে পারে, ভালো সাঁতারও কাটতে পারে। কম জলে হেঁটে পার হবে; বেশি জলে শুঁড় ওপরে তুলে মাথা বাঁচিয়ে সাঁতার দেবে। পোষা হাতিরা মাঝে-মাঝে মাহুতকে নিয়ে ভুশ ক'রে নদীতে ডুবে যায়। বেচারা মাহুতের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে ওঠে; কিন্তু আবার একটু পরেই হাতি নিঃশ্বাস নেবার জন্যে ভেসে উঠে পড়ে। প্রায় একশো বছর আগে ঢাকা থেকে ব্যারাকপুরে বেশির ভাগ জলপথে নাকি পঁচাত্তরটি হাতি আনা হয়েছিল।

মাঝরাত্রির পর, সব যখন নিঝুম, বড় জোর ঘণ্টা-খানেকের জন্যে হাতি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। নাক ডাকে! তার আগে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করে; তখন কান কিংবা ল্যাজ একেবারে নড়ে না। ঘোড়ার মতো তার একেবারে দাঁড়িয়ে ঘুমানোর কথা ঠিক নয়।

চোরাবালিতে হাতির বড় ভয়। একবার পা ডুবে গেলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু এ অবস্থায় দলের হাতিরা অনেক সময় বড় বড় গাছের ডাল ফেলে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। ডালের ওপর পা ফেলে ফেলে হাতি তখন কোনোরকমে উঠে আসে।

হাতি এমনিতে ঠাণ্ডা আর শান্তিপ্রিয়। কিন্তু 'মস্তি' হলে সে একেবারে বিগড়ে যায়। তখন সে হয় যেমনি নিষ্ঠুর তেমনি দুর্দান্ত। 'মস্তি' কেন হয় সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। 'মস্তি' দেখা দেয় ঠিক গ্রীষ্মকাল আরম্ভের মুখে।

হাতির চোখ আর মুখের মধ্যে একটি রসগ্রন্থি আছে; এক থেকে পাঁচ সপ্তাহ বা তারও বেশি—সাধারণত দু'তিন সপ্তাহ ধরে—এই গ্রন্থির মুখ থেকে রসক্ষরণ হয়। এই রস দেখতে আলকাতরার মতো কালো; খুবই তিক্ত আর তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত। হাতি শুঁড়ের ডগা দিয়ে এই রস যতই মুখে দেয়, ততই আরও বেশি ক্রুদ্ধ আর উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পুরুষ-হাতির এই অবস্থা স্বাভাবিক। জঙ্গলে কখনো কখনো স্ত্রী-হাতির মধ্যেও অনেকটা এই ভাব লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু পোষা স্ত্রী-হাতির কখনও 'মস্তি' হতে দেখা যায়নি।

বছর কুড়ি বয়সে, যখন যৌবন দেখা দেয়—তখন থেকেই 'মস্তি'র সূত্রপাত। এর পর পনেরো বছর ধরে এইভাবে যথাসময়ে গ্রন্থিরস ক্ষরণ হতে থাকে। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সে এটা বাড়তে আরম্ভ করে। বছর দশ-পনেরো পরে কমতে শুরু ক'রে ষাট বছর বয়সে বন্ধ হয়ে যায়।

'মস্তি' এক রকমের জৈব উত্তেজনা। মত্ত হাতি এই সময় স্ত্রী-হাতিদের ওপর জুলুম তো করেই, তাছাড়া অন্য পুরুষ-হাতিদের ওপরও চড়াও হয়। এমন কি যূথপতি হাতিকে পর্যন্ত সে তখন গ্রাহ্য করতে চায় না। অনেকে বলে, মস্তি থাকার দরুন যূথপতিকে খানিকটা সমঝে চলতে হয়—দলের নিরীহ হাতিদের ওপর সে তার স্বেচ্ছাচারী শাসন চালাতে পারে না। পাগলা হাতি যূথপতিকে

পর্যন্ত আক্রমণ ক'রে বসে। কারো কারো মতে, হাতির মস্তি হলে গাছের গায়ে তার গ্রন্থির রস লাগিয়ে রেখে জানিয়ে দেয়—এখন সে সাবালক হয়েছে, সুতরাং তার সঙ্গিনী চাই। কেউ কেউ বলেন যে, মস্তি না থাকলে হাতির দলের উৎকর্ষ ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেত। কারণ বৃদ্ধ যূথপতি নির্বিবাদে এই ঠাণ্ডা শান্তিপ্রিয় জীবদের ওপর প্রাধান্য চালিয়ে দলকে ক্রমশ দুর্বল ক'রে ফেলত। এই জৈব উত্তেজনার প্রয়োজন নাকি এইখানেই।

পোষা অবস্থায় মস্তির হাতি জঙ্গলের হাতির চেয়েও বেশি দুর্ধর্ষ হয়। অন্য হাতি বা মানুষ, যাকে পাবে তাকেই মারবে। তার প্রিয় মাহুতেরও তার থেকে রেহাই নেই। এই সময় তার চার পা বড় গাছ কি খুঁটির সঙ্গে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে খুব সাবধানে তাকে খেতে দিতে হয়। সবাই তখন তার ভয়ে তটস্থ।

হাতি একলা থাকলেই তাকে 'গুণ্ডা' বলে ধরে নেওয়া যায় না। দলের অনেক দাঁতলা হাতি, এমন কি দাঁতলা যূথপতিও সকালের দিকে আটটা নয়টা পর্যন্ত একা একা চরতে ভালোবাসে। আবার কোনো কোনো হাতি এমনিতেই একা থাকতে পছন্দ করে। দাঁত না থাকায় কোনো কোনো মাক্না চায় দলছাড়া হয়ে থাকতে।

দলপতি হওয়ার বা সঙ্গিনী পাওয়ার লড়াইতে হেরে গিয়ে পুরুষ-হাতি অনেক সময় দলছাড়া হয়ে একা একা ঘোরে। অথর্ব বা পঙ্গু হওয়ার জন্যেও কোনো কোনো হাতি দলছুট হয়ে পড়ে। সেজন্য একা থাকে বলেই কোনো হাতি 'গুণ্ডা' হয়ে যায় না।

যে হাতি ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি, লোক-জন, এমন কি অন্য হাতির ওপর চড়াও হয়ে, অনর্থক মারধর তছনছ করে তাদেরই বলে 'গুণ্ডা হাতি'। এরা বেশির ভাগই মধ্যবয়সী, গায়েও খুব জোর। কোনো কারণে দল থেকে বেরিয়ে গেলে এদের ভেতর মারকুটে স্বভাব দেখা দেয়। কারো কারো মতে, হাতির খাদ্যে ভিটামিনের অভাব হলে কিংবা তার রসগ্রন্থির ক্ষরণে ব্যাঘাত বা অসামঞ্জস্য দেখা

দিলে তার স্বভাবের এই পরিবর্তন হয়।

হাতির মাথায় অনেক কারণে খুন চাপে। কোনো শিকারী হয়তো কোনো সময়ে তাকে জখম ক'রে সরে পড়েছিল। সেই থেকে মানুষ জাতটার ওপরই হয়তো সে খাপ্পা হয়ে আছে। কোনো কোনো গুণ্ডা হাতিকে মারবার পর দেখা গেছে, এক সময়ে তাদের মাথায় কিংবা দাঁতের গোড়ায় গুলির চোট লেগেছিল। অনেক সময় অন্য হাতিও তাদের জখম হওয়ার কারণ হতে পারে। দলপতিত্ব বা সঙ্গিনী নিয়ে লড়াইয়ের সময় একটি হাতি হয়তো আর-একটি হাতির ল্যাজ কেটে দিয়েছিল কিংবা পেছনে দাঁত বসিয়ে তাকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছিল ; ব্যস, চোট খাওয়ার পর থেকেই সে হয়ে গেল 'গুণ্ডা হাতি'। কোনো কোনো গুণ্ডা হাতির ল্যাজের গোড়ার দিকে ফোড়া হওয়ার দাগও দেখা গেছে।

কোনো হাতি হঠাৎ কোনো কারণে আক্রমণ ক'রে বসলেই তাকে 'গুণ্ডা-হাতি' বলা যাবে না। এ-আক্রমণ নানা কারণে হতে পারে। বিশেষ ক'রে, হাতি যখন দিনে কিংবা রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে তখন হয়তো হঠাৎ আচমকা শব্দ হল, কিংবা একেবারে ঘাড়ের কাছে হঠাৎ কাউকে দেখতে পেল—সঙ্গে সঙ্গে সে আক্রমণ করতে পারে। জোড়-বাঁধার সময় হলে তুচ্ছ কারণে পুরুষ-হাতি, কিংবা অন্য সময়ে সঙ্গে বাচ্চা থাকলে ভয় পেয়ে স্ত্রী-হাতি, প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ ক'রে বসতে পারে। এদের কাউকেই তাই বলে 'খুনী গুণ্ডা' বলা যায় না। মানুষের দিকে এগিয়ে এলেই অতএব কোনো হাতিকে 'গুণ্ডা' বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

বছর-কয়েক আগে আমার এই ধরনের এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। জলপাইগুড়ির এক জঙ্গলে গিয়েছি বাঘ মারতে। হঠাৎ দেখি শত-খানেক গজ দূরে ফিকে গোলাপী রঙের এক দাঁতলা হাতি আমাদের জীপের দিকে এগিয়ে আসছে। রাইফেল বাগিয়ে ধরে সঙ্গীদের ফিস ফিস ক'রে বললাম, পঞ্চাশ গজের মধ্যে এলে তখন গুলি করব। দেখতে দেখতে সেই হাতি পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এল। আমার

সঙ্গীরা তখন জোরে চিমটি কেটে গুলি করবার কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। ততক্ষণে তার ফিকে গোলাপী রঙ দেখে আমি মুগ্ধ। ফিস ফিস ক'রে বললাম—পঞ্চাশ নয়, তিরিশ। আমি তৈরি ছিলাম। বিপদ বুঝলে মাথায় এক গুলি মেরে তাকে শুইয়ে দিতে পারব। কিন্তু এমন সুন্দর হাতিটাকে আগেভাগে মারতে কিছুতেই মন চাইছিল না। 'গুণ্ডা-হাতি' তো সে না-ও হতে পারে। শেষ পর্যন্ত আমাকে আর গুলি ছুঁড়তে হল না। কারণ তিরিশ গজ দূরে এসে হাতি থেমে গেল।

এবার বুঝতে পারলাম হাতিটির এগিয়ে আসবার আসল কারণ। হাওয়ায় গাড়ির গন্ধ পেয়ে সে কৌতূহলী হয়ে জিনিসটা দেখতে এসেছিল। তার অন্য কোনো বদ মতলব ছিল না।

ভাগ্যিস আমি বন্দুক চালাইনি। নইলে আপসোসের আর অন্ত থাকত না পরে। এই সুন্দর হাতিকে আমাদের গুলি করতে হল না বলে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। বন্ধুদ্বয় বললেন যে ফিকে গোলাপী রঙের হাতি এই প্রথম তাঁরা দেখলেন।

আগেই বলেছি, হাতি একলা হলেই যে সে খুনে হবে তা নয়। দু-বছর আগে জলপাইগুড়ির জঙ্গলে এক দাঁতলা হাতির একেবারে সামনে আমাদের জীপ এসে গিয়েছিল। আমরা রাইফেল নিয়ে তৈরি ছিলাম আক্রমণের জন্য। কিন্তু সে বেঁকে চলে গেল।

কেউ যদি হঠাৎ জঙ্গলে গুণ্ডা হাতির সামনাসামনি হয়, তাহলে এঁকেবেঁকে দৌড়ে পালিয়েও সে পার পাবে না। কেননা, হাতি সোজা এগিয়ে যাবে একটু দূরে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছু ফিরে তাকে ধরে ফেলবে। চার্জ করার সময় সে অতি বড় দৌড়-বীরকেও হারিয়ে দেবে। সে ক্ষেত্রে বড় গাছে উঠে পড়তে পারলেই ভালো; নইলে অন্তত বড় গাছের পেছনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পারলে বাঁচবার সম্ভাবনা থাকে।

জঙ্গলে হাতির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যদি গুলি করার সুবিধে বা ইচ্ছে না থাকে, তাহলে একেবারে চুপচাপ থাকতে হবে; নড়ে-

চড়ে বা শব্দ ক'রে তাকে চটিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

কয়েক বছর আগে নয়জন লোক নেফা অঞ্চলে ট্রাকে ক'রে যাচ্ছিল। সামনে এক হাতি এসে পড়ে। এ অবস্থায় তাদের উচিত ছিল মোটেই নড়াচড়া না ক'রে একেবারে চুপ ক'রে থাকা। কিন্তু এই নিয়ম তারা গ্রাহ্য করেনি। হাতি রেগে গিয়ে লোকসুদ্ধ ট্রাকটাকে সটান খাদে ফেলে দিল। নিজেদের আহাম্মকির ফলে সব ক'জন লোকই মারা গেল।

শুধু শুধু হাতি মারার আইন নেই। সরকারী গেজেটে 'গুণ্ডা-হাতি' বলে লেখা হলে তবেই তাকে মারতে পারা যাবে। অবশ্য গেজেটে 'গুণ্ডা-হাতি' বলে নথিভুক্ত নয় এমন হাতিকেও হঠাৎ আত্ম-রক্ষার জন্যে মারা চলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বনবিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারকে জানাতে হবে; হয়তো এইভাবে হাতি মারার দরুন কিছুটা হাঙ্গামাও পোহাতে হতে পারে।

গুণ্ডা-হাতি সব সময়ে শিকারীর মুখোমুখি হয় না। তার জন্যে তাকে অনেক সময় জঙ্গল খুঁজে বার করতে হয়। মাটিতে পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে শিকারী সাবধানে হাওয়া ঠেলে এগিয়ে যাবেন—বাতাস যেন তাঁর গন্ধ হাতির নাকে পৌঁছে দিতে না পারে।

হাতির লাদে যদি কখনও ধোঁয়া দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সে ঐখান দিয়ে গেছে। লাদ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বুঝতে হবে হাতিটি ঐ জায়গায় ছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে। গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে শিকারী এগুবেন নিঃশব্দে। যূথভ্রষ্ট গুণ্ডা-হাতি কিন্তু ভয়ানক শয়তান প্রকৃতির হয়। সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শিকারীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের গায়ে সে এমন ভাবে মিশে থাকে যে, তাকে চিনে বার করা খুব শক্ত হয়।

আক্রমণ করার আগে শিকারীকে দেখলে গুণ্ডা-হাতি ভয়ংকর চিল-চিৎকার ক'রে ওঠে; কিন্তু ঠিক চার্জ করার সময় সাধারণত ঐ রকম কোনো চিৎকার করে না।

হাতি চার্জ করলে শিকারীকে তৎক্ষণাৎ গুলি ছুঁড়তে হবে। হাতির শরীরের কোন্ জায়গায় তিনি গুলি করবেন সেটা সুযোগ এবং সময়ের ওপর নির্ভর করবে।

হাতি যখন মানুষ মারবার জন্যে তৈরি হয়ে আক্রমণ করে, তখন তার শুঁড় থাকে বুকের সামনে ; শুঁড়ের আগাটা থাকে সামনের পায়ের কাছে কিছুটা ভেতর দিকে গোটানো। আবার কখনো কখনো শুঁড়টা মাথার সামনে পাকানো থাকে ; কখনো বা ধরবার জন্যে সামনে সটান বাড়ানো থাকে।

হাতির মগজ তার মাথার পেছন দিকে একটু নিচে থাকে বলে সেখানে সহজে গুলি পৌঁছায় না। জায়গায় জায়গায় তার মাথার হাড় প্রায় নয় ইঞ্চি পুরু।

হাতির দু' চোখের মাঝ বরাবর ইঞ্চি-দুই ওপরে ফোলা জায়গার ঠিক পরেই আছে একটা টোল-খাওয়া ভাব। এই টোল-খাওয়া অংশের হাড় পাতলা বলে এখানে কোনোরকমে গুলি লাগাতে পারলে সহজেই মগজে পৌঁছে যায়। আর ঠিক এই জায়গায় গুলি খেলে গুণ্ডা-হাতি একটু সময় থ' হয়ে দাঁড়িয়ে, তারপরই হাঁটু ভেঙে ধপ ক'রে মাটিতে পড়ে যায়।

হাতিকে গুলি মারার দ্বিতীয় মোক্ষম জায়গা হল রগ, চোখ আর কানের মাঝখানে যে জায়গাটায় চোয়াল আর গলার হাড় এসে মিশেছে। তৃতীয় উপায় হল এক কানের ভেতর দিয়ে অন্য কান বরাবর গুলি চালানো।

শুঁড় যেখান থেকে শুরু হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে মুখের মধ্যে গুলি চালাতে পারলে হাতিকে অন্তত রুখে দেওয়া যায়।

এ বাদে আছে তার হৃৎপিণ্ড। অন্য জন্তুর চেয়ে একটু নিচের দিকে সামনের দু' পায়ের আড়ালে থাকে হাতির হৃৎপিণ্ড। কিন্তু মাংস আর চর্বির পিণ্ড ভেদ ক'রে হাতির হৃৎপিণ্ডে গুলি পৌঁছনো খুবই কষ্টকর। হাতির শক্ত পেশীবহুল এই হৃৎপিণ্ডটি দেখতে অনেকটা ফুটবলের মতো।

হাতিকে রুখবার যখন আর কোনো উপায় থাকে না তখন তার সামনের ছ' পায়ের হাঁটুতে গুলি ক'রে তাকে থামাতে হয়। হাতি মারবার জন্যে অন্তত চারশো গ্রেন হার্ড বুলেট ছোঁড়বার মতো ভারি রাইফেলের দরকার।

হাতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নিতান্তই যদি ছুটে পালাতে হয়, তাহলে যাওয়া উচিত উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায়—কিন্তু ভুলেও নিচু থেকে উঁচুতে নয়। খুব বড় গাছে উঠতে পারলে প্রাণ বাঁচবে। তেড়ে-আসা হাতির সামনে টুপি, জামা বা অন্য কিছু ফেলে দিয়ে খানিকটা সময় পাওয়া যেতে পারে। হাতি যখন সেটা ছিঁড়ে-কুটে ফেলতে থাকবে, তখন সেই ফাঁকে শিকারী গাছে উঠে পড়তে পারবেন। অনেক সময় কিন্তু হাতি ওসব গ্রাহ্যও করে না। একবার চার্জ করতে আরম্ভ করলে হাতি তাড়াতাড়ি নিজের ডাইনে ঘুরতে পারে না। কাজেই কখনো তার সামনাসামনি পড়ে গেলে শিকারী যদি তাঁর নিজের বাঁ দিকে দৌড় দেন (অর্থাৎ হাতির ডান দিকে) তাহলে তিনি গুলি করার বা গাছে চড়ার জন্যে একটু সময় পাবেন।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। অনেক সময় হাতির দল শিকারীকে না দেখেই তার দিকে ছুটে আসে। বিশেষ ক'রে জঙ্গল যদি ঘন হয়। সে ক্ষেত্রে শিকারীকে একটা গাছ কিংবা পাথরের আড়ালে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝে নিতে হবে যে, তারা শিকারীকে দেখে চার্জ করছে, না ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

হাতির দল শিকারীকে যদি দেখে ফেলে তাহলে মারবার জন্যে তাঁকে তখন গুলি চালাতেই হবে। সামনের হাতি গুলি খেয়ে পড়ে গেলে তার পাশ দিয়ে অন্য হাতিরা ছুটে যাবে; শিকারী তখন সেই নিহত হাতির আড়াল থেকে আবার গুলি ছুঁড়তে পারবেন।

সাধারণত ষোলো বছর বয়স থেকে স্ত্রী-হাতির বাচ্চা হওয়া শুরু হয়; অবশ্য দশ বছর বয়সেও কারো কারো বাচ্চা হতে দেখা গেছে।

নভেম্বর থেকে জানুআরি—এই সময় নাগাদ পুরুষ-হাতি আর স্ত্রী-হাতিকে জোড় বেঁধে চলতে দেখা যায়। শুঁড় দিয়ে তারা পরস্পরকে ভাব-ভালোবাসা জানায়; এ ওকে আদর ক'রে ভালো ভালো ডালপালা ভেঙে, লতাপাতা ছিঁড়ে খেতে দেয়। দু'তিন মাস ধরে এই রকম চলে। রাত্তিরটা দল ছেড়ে থাকলেও সকাল হলেই স্ত্রী-হাতি আবার দলে ফিরে আসে। তার প্রতি যদি একসঙ্গে দু'টো পুরুষ-হাতির টান থাকে, তাহলে তাকে নিয়ে দুই পুরুষ-হাতির মধ্যে লড়াই লেগে যাবে। দলের সাক্ষাতেই এ লড়াই হয়; দলের বাকি সবাই কিন্তু গোটা ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করবে। তারপর চলতে থাকবে দু'টি তিন টন জানোয়ারের মধ্যে ভীষণ মাথা ঠোকাঠুকি। একবার নয়, দুবার নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—যতক্ষণ না দু'টির একটি হাঁটু ভেঙে পড়ে যায় কিংবা পালায়।

লড়াইটা হয় খুবই মারাত্মক ধরনের। দাঁত ভেঙে দেওয়া, ল্যাজ কেটে দেওয়া—এ সব তো হয়ই। কিন্তু আঘাত সবচেয়ে সাংঘাতিক হয় যখন কোনো হাতি বিপক্ষের পেছনের দু' পায়ের মাঝখানে বড় দাঁত ফুটিয়ে দেয়। এতে অন্ত্র ছিঁড়ে গিয়ে এবং ভেতরকার অণ্ডকোষে চোট লেগে হাতির প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়।

এদিকে দশমাস পর্যন্ত স্ত্রী-হাতি বুঝতেই পারে না তার বাচ্চা হবে কি-না। দশমাস কেটে যাওয়ার পরও সে আগের মতোই অবাধে চারিদিকে চলাফেরা করে, অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু সাবধান হয়।

সাধারণত মাদী বাচ্চা হয় কুড়ি মাসে; আর মদ্দা বাচ্চা হতে নেয় বাইশ মাস সময়। যারা বনের খবর রাখে, তারা বলে বেশির ভাগ হাতির বাচ্চা হয় মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে।

বাচ্চা হওয়ার বেশ কিছু আগে থেকেই স্ত্রী-হাতি তার দলের এক বলিষ্ঠ আর বিজ্ঞ হস্তিনীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেয়। এ হবে তার বাচ্চার মাসী। আপদে বিপদে এই মাসী তাদের দেখবে এবং দরকার হলে নিজের প্রাণ দিয়েও তাদের রক্ষা করবে। কারণ, জঙ্গলে

বিশেষ ক'রে হাতির কচি বাচ্চাদের ওপর বাঘের খুব লোভ থাকে।

বাচ্চা হওয়ার দু'-তিন দিন আগেই মা আর মাসীতে মিলে জঙ্গলের মধ্যে সাধারণত বড় গাছের তলায় একটা গোল জায়গা বেছে নিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেলে। জায়গাটার চারদিকে একটু ঝোপ থাকা চাই। বনে পাহাড়ী নদী থাকলে এমন জায়গা বেছে নেবে যার তিনদিকে জল আর একদিকে আড়াল-করা ঝোপ আছে।

হাতির দল কাছাকাছি থেকে পাহারা দেয়। দলপতি হস্তিনীও সব সময় তৈয়ার—বিপদ দেখলেই সাহায্য করতে ছুটে যাবে।

তারপর তো যথাসময়ে হাতির বাচ্চা হল। সাধারণত হয় একটিই; কখনও কখনও যমজ। বাচ্চা কে বলবে! বাচ্চা না হাতি! যখন পেট থেকে পড়ল তখনই মাথায় প্রায় তিন ফুট।

জন্মের সময় হাতির বাচ্চার চোখ জোড়া থাকে। পড়ে থাকে ন্যাতার মতো। তার মা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে তাকে তুলে ধরে। তখনও তার তেমন সাড়া থাকে না। ঘোড়ার বাচ্চা কিংবা হরিণছানার মতন তড়বড়ে নয়। শুঁড়টি ঝোলে দড়ির মতো। প্রথম দু'দিন বেচারা তার মায়ের সামনের দু'-পায়ের মাঝখানে বুকের দুধের নাগাল পায় না। তারপর আস্তে আস্তে—শুঁড় দিয়ে নয়—মুখ দিয়ে দুধ খেতে অভ্যাস করে।

এদিকে মা আর মাসী সব সময় সজাগ। বাচ্চা হওয়ার কথা বাঘ যাতে জানতে না পারে, তার জন্য গর্ভের ফুল হয় খেয়ে ফেলে, নয় মাটি বা গাছপালা দিয়ে ঢেকে দেয়। বাঘ কিন্তু জানতে পারলে হঠাৎ আচমকা এসে থাবা দিয়ে হাতির বাচ্চাকে মেরে ফেলে পালাবে; পরে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেলে ফিরে এসে খাবে। কিংবা মা-হাতিকে জখম ক'রে তাড়িয়ে দেবে। মাসী যদি পাহারায় থাকে, বাঘকে সে প্রাণপণে একাই রুখবে—ততক্ষণে মা-হাতি এসে গেলে বাঘ মানে মানে সরে পড়বে।

বাচ্চা হওয়ার দু'-তিন দিন পর হাতির দল ধীর কদমে চলতে আরম্ভ করে। বাচ্চার পাছে অসুবিধে হয়, সেইজন্যে দলটি আরও কিছুদিন আস্তে আস্তে চলে। মাসখানেক পর বাচ্চাটি মহানন্দে হাঁটতে আরম্ভ করে। নদীনালা এলে তার মা শুঁড় দিয়ে তাকে তুলে ধরে কিংবা কখনও কখনও নিজের পিঠের ওপরে নেয়।

জন্মাবার পর ছয় মাস পর্যন্ত বাচ্চা সবসময় মা'র সঙ্গে সঙ্গে থাকে ; কখনো বা থাকে তার মাসীর সঙ্গে। প্রথম ছয়মাস মা'র বুকের দুধই তার একমাত্র সম্বল। ছয় মাসের পর মা তাকে নরম নরম গাছপালা, ফল, লতাপাতা ইত্যাদি বেছে বেছে একটু একটু ক'রে খাওয়া শেখায়। কিন্তু তবু প্রায় তিন বছর ধরে সে মা'র বুকের দুধ খেয়ে চলে।

একবার একটা ভারি মজার দৃশ্য দেখেছিলাম। বনবিভাগের এক হাতিতে চড়ে সেবার বাঘের জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। গোড়ায় লক্ষ্য করিনি ; পরে দেখি হাতির পেছনে পেছনে হাতির একটা বাচ্চাও চলেছে। দশ-পনেরো মিনিট যাওয়ার পরই দেখি মা-হাতি থেমে পড়ছে। আর বাচ্চাটা ছুটে এসে তার বুকের দুধ খাচ্ছে। এদিকে সূর্য অস্ত গেলে শিকার তো আমার মাথায় উঠল। এখন বাঘ এসে যদি ঐ বাচ্চাটাকে ধরে! এমনিতেই তো রাস্তায় বড় ডালপালা পড়লে সে নাচার। তার মা শুঁড় দিয়ে ডাল সরিয়ে দিলে তবেই সে এগোতে পারে। নেহাত কপালের জোর ছিল বলেই বোধহয় বনে সেদিন বাঘ বেরোয়নি।

হাতির এই বুকের দুধ খুবই পুষ্টিকর। সের-আড়াই গরুর দুধে আড়াই ছটাক মালাই আর এক ডজন ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে এক সের একেবারে গলা ভাত মাখলে এই দুধের সমান খাদ্যগুণ পাওয়া যায়। বাচ্চার পক্ষে দিনে দুবার ক'রে দরকার এই পরিমাণ খাদ্যগুণ। সেইজন্যেই মা'র বুকের দুধে হাতির বাচ্চার এত ঝোঁক।

বাচ্চা হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মা-হাতি যদি মারা যায়, তাহলে বাচ্চার ভোগান্তির একশেষ হয়। দলের মধ্যে আর কাউকে সে তখন

মা হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পরের সন্তান কেউই সহজে ঘাড়ে নিতে চায় না। শেষ পর্যন্ত হয়তো তার ওপর কোনো মা-হাতির মায়া পড়ে যায়। তার এই নতুন মা'র ছোট বাচ্চা থাকলে দু'টিতে তখন মাণিকজোড়ের মতো ভাব হয়।

মা-হাতি এত সন্তানবৎসল, প্রাণ দিয়ে তার সন্তানকে রক্ষা করে—তবু কিন্তু তার স্বভাবে একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। একটানা চার-পাঁচদিন কোনো কারণে বাচ্চা কাছ-ছাড়া বা উধাও হওয়ার জন্যে মা'র বুকের দুধ যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে পরে তার বাচ্চাকে সে আর চিনতে পারে না বা তার প্রতি সে কোনো দয়ামায়াও দেখায় না। এটা জানে বলেই বোধহয় হাতির বাচ্চা কখনও তার মাকে ছাড়ে না। বছর-পাঁচেকের হলে তখন সে নিজের খাবার জোগাড় করতে পারে। তার তিন বছর বয়সের পর মা'র আবার সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিলে, সে আস্তে আস্তে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে।

বনের স্ত্রী-হাতির সারা জীবনে মোট পনেরোটির মতো সন্তান হতে পারে। পোষা-হাতির আরও কম সন্তান হয়। অনেক সময় যথোচিত খাদ্যের অভাবে কারো কারো হয়তো একেবারেই বাচ্চা হয় না। পোষা স্ত্রী-হাতি বরাবর প্রায় একই পুরুষ-হাতির সঙ্গিনী থাকে। কিন্তু জঙ্গলে থাকলে স্ত্রী-হাতি প্রত্যেক তিন বছর অন্তর একটি ক'রে নতুন পুরুষ-হাতি বেছে নেয়। এ বিষয়ে আফ্রিকান স্ত্রী-হাতি একটু বেশি একনিষ্ঠ।

হাতির বাচ্চা সাবালক হতে অনেক সময় নেয়। সে পুরোপুরি সাবালক হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে। পোষা-হাতিকে দিয়ে কাজ করানো হয় বিশ বছর বয়স থেকে ; আরও পাঁচ বছর পর সে কাজকর্মে পোক্ত হয়।

বনের হাতিকে শতবর্ষ তো বটেই, এমন কি দেড়শো বছরও বাঁচতে দেখা গেছে। পোষা-হাতি সত্তর বছর বাঁচলেই যথেষ্ট। শোনা যায়, মহীশূরের রাজার একটা হাতির একশো বছর বয়স হয়েছিল। পোষা-হাতিকে অতিরিক্ত খাটালে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের

বেশি সাধারণত সে বাঁচে না।

একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, হাতিদের মরবার সময় হলে সবাই একটি জায়গায় চলে যায়; সেটা তাদের সকলের কবর-স্থান। সত্যিই কোথাও কোথাও একসঙ্গে অনেক হাতির হাড়গোড় পাওয়া গেছে; যেমন, আলাস্কায় বা সাইবেরিয়ায়। কিন্তু তার আসল কারণ অন্য; কোনো রকম বিপর্যয় হয়ে বা দুর্ঘটনায় কখনো হয়তো পুরো হাতির একটা পাল এক জায়গায় মারা গিয়েছিল। পরে বহু সংখ্যক হাড়গোড় দেখে কবর-স্থানের ভিত্তিহীন ব্যাপারটা লোকে কল্পনা ক'রে নিয়েছে।

হাতি জরাগ্রস্ত বা রুগ্ন হয়ে পড়লে, জল পাওয়া যায় এমন কোনো জায়গায় দলছাড়া হয়ে একা একা চলে যায়। তারপর আস্তে আস্তে সেখানেই তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। জঙ্গলের মাটিতে কালক্রমে তার শরীর মিশে যায়। নদীর বানে ভেসে গিয়ে হাড়-কঙ্কালগুলো হয়তো বাধা পেয়ে পেয়ে একই জায়গায় জমতে থাকে।

হাতির যেমন গায়ের জোর তেমনি বুদ্ধি। তাই হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সমানে তাকে নিজের কাজে লাগিয়েছে। বুনো হাতিকে জঙ্গলে ধরার জন্যে মানুষ অনেক কলকৌশল বার করেছে।

যেখানে লোকবল কম এবং ছোট দু'-একটি হাতি ধরলেই চলে, সেখানে বন-জঙ্গলের বাসিন্দারা খাবারে আফিম মিশিয়ে জঙ্গলের ধারে রেখে দেয়। সেই খাবার খেয়ে হাতি বেহুঁশ হয়ে পড়ে, এবং তখন তাকে সহজেই ধরা যায়। কিন্তু হাতির ঘ্রাণশক্তি এতই প্রখর যে প্রায়ই সে এরকম নেশাজনক খাবার ছোঁয় না।

হাতির চলাফেরার রাস্তায় গর্ত খুঁড়ে রেখেও তাকে ধরার চেষ্টা করা হয়। গর্ত খুব বেশি গভীর করার দরকার হয় না। হাতি যাতে ভেতরে পড়ে যায় গর্ত সেইরকম হলেই হবে। গর্তের ওপর সরু কঞ্চি আর ঘাস লতাপাতা এমনভাবে বিছিয়ে রাখতে হবে যাতে হাতি বুঝতে না পারে। এই গর্তে খুব শক্ত তারের ফাঁদ পাতা

থাকে। ফাঁদের একদিকে রাখা হয় খুব ভারি একটি কাঠের গুঁড়ি। ফাঁদে একবার পা আটকে গেলে, যত বড় হাতিই হোক, সে বেশি দূর যেতে পারবে না।

গর্ত কেটে আরেকরকম ভাবেও হাতি ধরা যেতে পারে। যে রাস্তা দিয়ে হাতি চলাচল করে, সেখানে আট হাত লম্বা ক'রে চওড়া আর গভীর গর্ত কেটে খুব ভালোভাবে ঢেকে রাখতে হবে; বাইরে থেকে দেখে হাতির যেন কোনোরকম সন্দেহ না হয়। খোঁড়া মাটি, কাটা গাছপালা—সব কিছু দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। গর্তের মধ্যে এক হাত পুরু ক'রে লতাপাতা ঘাস বিছানো থাকবে, যাতে পড়ে গিয়ে হাতি বেশি চোট না পায়। হাতি যখন গর্তে পড়ে যাবে, তখন তার মাথার উপর একটুকরো কাপড় দোলালেই সে রেগে যেমনি শুঁড় তুলে সেটা ধরতে যাবে, ফাঁদীরা অমনি নিমেষে তার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দেবে। দড়ির ফাঁসে হাতিকে যারা বেঁধে ফেলে তাদের বলা হয় 'ফাঁদী'। ফাঁদীরা দেখে, দড়ির ফাঁস যেন আবার এমন শক্ত ক'রে বাঁধা না হয় যাতে হাতি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। এরপর তার পেছনের পা ধীরে-সুস্থে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে।

আরেকরকম ব্যবস্থা আছে; তাকে বলে 'মেলা-শিকার'। হাতি ধরবার কাজে যে পোষা-হাতি সাহায্য করে তাকে বলে 'কুনকী'। মেলা-শিকারে কুনকী-হাতির পিঠে চড়ে ফাঁদীরা গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে বন্য হাতিকে ধরে ফেলে। মাহুত আর ফাঁদীরা এইভাবে যখন হাতি ধরতে যায়, তখন তারা কম্বল দিয়ে গা ঢেকে রাখে। হাতির দল কাছে এগিয়ে যায়। যাতে মানুষের গন্ধ টের না পায়, তার জন্যে তাদের গায়ের কম্বলে হাতির বিষ্ঠাও মাখানো থাকে।

স্ত্রী-হাতি বা মাক্‌নারা কুনকী-হাতি হিসেবে খুব কাজ দেয়। পালোয়ান পুরুষ হাতিকে বশ করতে কখনো কখনো পোষা দাঁতলা হাতিরও ডাক পড়ে।

হাতি ভয় পেলে তার শুঁড় মাথার সামনে গোল ক'রে গুটিয়ে রাখে। ফাঁদী সেই ফাঁকে বাঁশের ডগায় দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা হাতির গলায় পরিয়ে দিয়ে টেনে দেয়।

হাতি-ধরার খরচ যোগায় কুনকী-হাতিদের মালিকরা। আসামে এই ধরনের 'মেলা-শিকারে'র প্রচলন খুব বেশি। তিন থেকে ছয় মাস ধরে এমনি ক'রে জঙ্গলে কাজ চলে।

আর আছে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে হাতি ধরার ব্যবস্থা। জঙ্গলে একটি শক্ত বেড়া দেওয়া ছোট জায়গায় একটি পোষা স্ত্রী-হাতি রেখে দেওয়া হয়; খোলা দরজা দিয়ে বনের পুরুষ-হাতি যেই তার কাছে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে দেওয়ার ফলে দরজাটা ঝপ্ ক'রে বন্ধ হয়ে গিয়ে বনের হাতি আটকা পড়ে যাবে।

এর বড় সংস্করণই হচ্ছে 'খেদা'। যাকে ইংরেজিতে বলে 'স্টকেড'। জঙ্গলে 'সল্ট-লীক' অর্থাৎ জানোয়ারদের নুন চাটবার জায়গায় কিংবা হাতিদের যাতায়াতের পথে একটি ছোট জায়গা বেছে গোল ক'রে ঘিরে ফেলা হয়। সাধারণত এই ঘেরা জায়গাটা আয়তনে হয় টেনিস কোর্টের প্রায় দেড় গুণ। চারধারে দেওয়া হয় খুব শক্ত মোটা গাছের বা বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি মজবুত বেড়া। বেড়ার ভেতরে কাটা হয় বেড়ার গা বরাবর অন্তত সাত ফুট চওড়া একটি গভীর নালা বা পরিখা। প্রবেশ-পথের দরজার কাছে অবশ্য নালা কাটা হয় না। সমান্তরাল আর কোনাকুনি খুঁটি বেঁধে তার গায়ে চাপ-চাপ মাটির ঠেস দিয়ে খুঁটির বেড়া শক্ত করা হয়। হাতির গায়ে প্রচণ্ড জোর; কাজেই তাদের আটকে রাখতে গেলে বেড়াটি দারুণ মজবুত হওয়া দরকার। কোথাও এতটুকু প্রলকা হলে হাতি-ধরার গোটা ব্যাপারটাই পণ্ডশ্রম হবে।

বেড়ার বাইরে থাকে দর্শকদের জন্যে তৈরি মঞ্চ আর বন্দুকধারী পাহারাদার। কারণ, অনেক সময় অনেক বেয়াড়া হাতি খেদা ভেঙে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিংবা অন্য হাতিকে মেরে ফেলতে চায়।

বেড়ার ভেতরের জায়গাটি হবে বেশ ছিমছাম ; বাইরে থেকে দেখে দলপতি হস্তিনীর যেন কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। সন্দেহ হলে দল নিয়ে কিছুতেই সে ভেতরে ঢুকবে না। ঢুকবার দরজাটিও এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে দরকার হলেই চটপট তোলা বা নামানো যায়।

খেদার জন্যে সব যখন তৈরি, তখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন লোককে দিয়ে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়ে বনের মধ্যে হাতির দলকে বিচলিত ক'রে তুলতে হবে। তাই বলে তাদের যেন খুব বেশি ভয় পাইয়ে দেওয়া না হয়। রাত্রে মশাল জ্বেলে, শব্দ ক'রে একেবারে খেদার ভেতর কোনোরকমে তাদের ঠেলে নিয়ে যেতে হয়।

দলপতি হস্তিনীটিকে খেদার ভেতর একবার ঢোকাতে পারলেই, ব্যস্—ছোট-বড় সবাই তার দেখাদেখি ভেতরে ঢুকবে। তখন সে কী হৈ-চৈ, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি! ভেতরে এমন ঠাসাঠাসি হয় যে একটু নড়বারও উপায় থাকে না। কেউ যে ঘুরে বাইরে যাবে তাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে যাবার আর পথও থাকে না—কারণ, ততক্ষণে দড়ি কেটে দরজাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

মা-হাতিরা তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভিড়ের মধ্যে বাচ্চাদের সামলাতে। বাকি সবাই চাইছে নিজেরা কোনোরকমে বাঁচতে। মনে তাদের রাগ, আর প্রাণে ভয়। দেখে মনে হয়, সবাই ক্ষেপে গেছে। ঘাস-লতাপাতায় আর তাদের মলমূত্রে গোটা জায়গাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই নরককুণ্ড হয়ে ওঠে।

তারই মধ্যে বিশেষ ক'রে দাঁতলা হাতিরা প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনো উপায় নেই। বাইরে তখন সমানে বন্দুকের আওয়াজ, ঢোল আর ক্যানেস্তারা বেজেই চলেছে। অনেক সময় খেদার মধ্যে মারাত্মক ধরনের ও দুর্দান্ত প্রকৃতির হাতিকে গুলি ক'রে না মেরে উপায় থাকে না।

এবার আসে কুনকী-হাতি আর ফাঁদীর দল। কুনকীরা শিক্ষিত পোষা-হাতি—হস্তিনী কিংবা মাক্না। আর ফাঁদীরা বনের হাতিকে

বেঁধে ফেলবার কাজে বিশেষ পাকাপোক্ত। কুনকীদের মাহুতরাও রীতিমতো ওস্তাদ।

হাতি ধরার কাজে পোষা বুড়ো হাতি অচল; বাচ্চা আছে বা বাচ্চা হতে যাচ্ছে এমন স্ত্রী-হাতিকে কুনকী করলে অনেক সময় অনেক মুশকিলে পড়তে হয়। যদি খুব বড় দাঁতলা হাতি হয় তাহলে তাকে উপযুক্তভাবে তালিম দেওয়া যায় না। কাজেই কুনকী করার জন্যে দেখেশুনে পোষা হাতি বাছতে হয়।

হাতি ধরার কাজে কুনকীরা রীতিমতো পটু। আর বাঁধার কাজে সিদ্ধহস্ত ফাঁদীরা এই কুনকী-হাতির পিঠে চড়ে গলায় দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে বনের হাতিকে বেঁধে ফেলে; তারপর তাকে বাইরে টেনে এনে দড়ি দিয়ে পা বেঁধে দেয়। কুনকী-হাতিকে চালাবার কৌশলে মাহুতরাও কম যায় না। সব কিছু মিলিয়ে এই খেদা জিনিসটা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখে।

খেদা থেকে হাতির দলকে ধরে বেঁধে সরিয়ে আনতে কখনো কখনো একদিন কি তার চেয়েও বেশি সময় লেগে যায়। কত সময় লাগবে সাধারণত সেটা নির্ভর করে কত হাতি ধরা পড়েছে তার ওপর। তাছাড়া কোনো কোনো দুর্দান্ত হাতিকে বাগে আনবার জন্যে অনেক সময় একাধিক কুনকীর দরকার হয়; ফলে, কুনকী কম থাকলে সময়ও বেশি লেগে যায়।

বনের হাতি ধরা পড়ার পর শুরু হয় তাদের দুরন্ত করা এবং তালিম দেওয়ার পর্ব।

হাতির বাচ্চারা ধরা পড়ার পর দশ দিনের মধ্যে হুকুম তামিল করতে শেখে। পায়ে চেন বাঁধার ব্যাপারটা তিন-চারদিনের মধ্যেই এদের গা-সহা হয়ে যায়। যাদের বয়স পাঁচ-ছয় বছরের বেশি, তারা সাধারণত মাসখানেকের মধ্যেই বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেয়; কিন্তু কাজের উপযুক্ত হতে এদের আরও বছর দেড়েক সময় লাগে।

যত গোলমাল বাধে ধাড়িদের নিয়ে। তারা কেউ কেউ পাগলের

মতো ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মারামারি ঠেলাঠেলিতে প্রাণ হারায়; কেউ মরে ঘামে গরমে, আর তারপর ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিউমোনিয়া রোগে। কেউ কেউ বন্দীদশা সহ্য করতে না পেরে অনশনে মৃত্যুবরণ করে।

বনের হাতিকে বশ করা সহজ কথা নয়। গোড়ায় তার চার পা চারটি খুঁটি বা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়। কারণ, একটু চাঙ্গা হলেই তারা তেড়ে-ফুঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে। পেছনের পা বাঁধা না থাকলে বারবার খাড়া হয়ে উঠতে চায়। চারদিকে কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি ছোট জায়গায় আটকে রেখে আলাদাভাবে তাদের কাউকে কাউকে ঢিট করার দরকার হয়। একটু ধাতস্থ হলে খাবার দিতে হবে। গোড়ায় গোড়ায় খাবার সে মুখেই দেবে না—পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট ক'রে ফেলবে; পরে নিরুপায় হয়ে একটু একটু ক'রে খেতে শুরু করবে। দরকার হলে মাঝে মাঝে তাকে অঙ্কুশ মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে। একটু ঠাণ্ডা হলে লতাপাতা, ঘাস, ছোলা, ধান, নুন, রান্না-করা ভাত কিংবা চাপাটি খেতে দেওয়া হবে। খেদায় ধরবার সময় কিংবা শেকলে বাঁধার জন্যে কেটে ছড়ে গিয়ে থাকলে ওষুধ দিয়ে ব্যথা বা ঘা সারাতে হবে।

হাতি যখন বোঝে যে, তার পক্ষে আর পালানো সম্ভব নয়, মানুষকে যখন সে তার বন্ধু এবং মনিব বলে ভাবতে আরম্ভ করে, তখন তার গোলমাল কমে আসে। দু'ধারে দুই কুন্‌কী রেখে রোজ দিনে দু'বার ক'রে তাদের হুকুম তামিল করা শেখানো হয়। বিশেষত, সামনে বা পিছনে ঘুরে যেতে বা আসতে।

এই সময় কাছের নদীতে রোজ তাদের স্নান করানো হয়। এত দুঃখের মধ্যেও নদীতে পেট পুরে জল খেয়ে, শুঁড় দিয়ে গায়ে জল ছিটিয়ে কিংবা জলে শুয়ে থেকে তারা বেশ খানিকটা আরাম পায়।

পোষা-হাতিকে রোজ স্নান করানো সম্ভব না হলেও মাঝে মাঝে তাদের গায়ে তেল মাখিয়ে, সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ময়লা তুলে জলের ঝাপ্টা দিয়ে তাদের গা ধোয়াতে হবে।

হাতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, কথা না শুনলে শাস্তি আর তিরস্কার এবং কথা শুনলে আদর আর পুরস্কার। বেয়াড়াপনা করলে হাতিকে মারতে হবে কয়েকটা বাছাই-করা জায়গায়—বাঁশ কিংবা অঙ্কুশ দিয়ে মাথায়, চাবুক দিয়ে শুঁড়ে কিংবা পায়ের নিচের দিকে, ঘাড়ের পেছনে, কানে। পিঠের ওপর দিককার শিরদাঁড়ায় কখনো আঘাত করতে নেই। কারণ, বেকায়দায় লেগে গেলে হাতি চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। হাতির পেটেও কখনো আঘাত করতে নেই।

মাত্র দু' মাসের মধ্যেই হাতি তার নিজের খাবার পিঠে ক'রে বয়ে আনতে শেখে। কুন্‌কীর সাহায্য ছাড়াই তাকে তখন স্নান করিয়ে আনা যায়। প্রথম প্রথম তার পেছনের পা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে; পরে সামনের পা দু'টিকেও বাঁধা হয়; এতে তার পক্ষে চলাফেরা করার কিছুটা সুবিধা হয়।

মাহুত আর তার সাকরেদ সব সময় বিভিন্ন কথা বলে হাতিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। হাতিকে তারা তার নাম ধরে ডাকে এবং রোজ একই ভাষায় তারা হুকুম তামিল করতে বলে:

বৈঠ—বসে পড়
মাইল—উঠে পড়
আগাৎ—চলো
পিছে—পেছনে চলো
ধ্যোৎ—থামো
বিরি—ছেড়ে দাও
ছৈ—ঘুরে যাও
ফির—পাশ ফেরো।

তাদের এ রকম আরও অনেক কথা আছে।

প্রথম প্রথম শুঁড়ের কাছ থেকে মাহুতের একটু দূরে থাকা উচিত। পরে সে একটু একটু ক'রে শুঁড়ে হাত বুলিয়ে আদর করবে।

প্রথম প্রথম হাতি তাকে বাধ্য হয়ে সহ্য করে; কিছুদিন গেলে মাহুতকে সে সত্যিই পছন্দ করতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত মাহুতকে সে এত ভালোবেসে ফেলে যে, তাকে দেখতে না পেলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। মাহুতের ছেলে ও বউকে সে চেনে। এমন কি মাহুতের ছোট বাচ্চা থাকলে, সে পাহারাও দেয়; শুঁড় দিয়ে ডালপালা নিয়ে ঘুমন্ত বাচ্চার গা থেকে মাছি মশা তাড়ায়।

ধীরে ধীরে এভাবে তাদের না শিখিয়ে যদি শুধু মারের ওপর নির্ভর ক'রে কাজ আদায় করা হয়, তারা ভিতরে ভিতরে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠে এবং পরে হঠাৎ একদিন হিংস্র ভাব ধারণ ক'রে সব কিছু তছনছ ক'রে দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শুধু দয়া দেখিয়ে কাজ আদায় করলেও তার ফল বিষময় হতে পারে। দৃঢ় অটলভাবে হাতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মানুষ তার মনিব, তার আদেশ অমান্য কিংবা অগ্রাহ্য করলেই কপালে শাস্তি আছে, আর হুকুম মেনে নিলে যথাযথ পুরস্কার ও আদর মিলবে।

হাতিকে তালিম দেবার সময় একথা ভুললে চলবে না যে, তাকে শুধু মারধর নয়—আবার শুধু আদরও নয়।

হাতি যখন হুকুম মেনে চলতে শিখবে, তখন আস্তে আস্তে তাকে পিঠে ভার বা সওয়ারী নিতে শেখাতে হবে। গোড়ায় কম ওজন; তারপর ক্রমে ক্রমে ভার বাড়িয়ে সাত মন করতে হবে। হাতির পিঠে এর চেয়ে বেশি ভার চাপানো ঠিক নয়। হাতিকে খুব বেশি খাটানো কিংবা দিনে তিরিশ মাইলের বেশি রাস্তা হাঁটানো উচিত নয়। তবে বিপদের সময় এর ব্যতিক্রম করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বর্মা থেকে মণিপুরের দিকে উদ্বাস্তু ও যুদ্ধের মাল নিয়ে আসার সময় বিশালকায় দাঁতলা 'ব্যাণ্ডুলা' নামক হাতির নেতৃত্বে পোষা হাতির দল অপূর্ব সহ্যশক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিল।

পিঠে সওয়ারী তোলার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, হাতি প্রথমে পেছনের পা ছড়িয়ে পেটের ওপর ভর দিয়ে মাটিতে লম্বা হবে; সুবিধে মতো হয় ডাইনে নয় বাঁয়ে কাত হবে; সওয়ারী তখন তার

পিঠের ওপর চড়ে বসবে। এতে অবশ্য হাতির বেশ পরিশ্রম হয়, সেই জন্যে বেশিবার তাকে এভাবে ওঠ-বোস করানো ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। হাতি অনেক সময় তার সুবিধের জন্যে একটা দিকে কাত হতে চায়; তাকে জোর ক'রে অন্য দিকে কাত হতে বললে মনে মনে সে বিরক্ত হয়। হাতি তার রাগগুলো পুষে রাখে। পরে একদিন সুযোগ পেলে হিংস্রভাবে তার প্রতিশোধ নেয়।

সব হাতির শিরদাঁড়া এক রকমের নয়। তাই শিরদাঁড়া অনুযায়ী হাতির পিঠের উপযোগী আলাদা আলাদা প্যাড বা গদি বানিয়ে নেওয়া উচিত। তা না হলে গদির দোষে হাতি খুবই কষ্ট পায় এবং শেষ পর্যন্ত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

হাতির সামনের পায়ে ভর দিয়ে, কান আর গলার দড়ি ধরে কিংবা শুঁড় ধরে মাহুত হাতির ওপর উঠে পড়ে। এভাবে উঠতে গেলে চাই হালকা শরীর এবং সেইসঙ্গে রীতিমতো অনেক দিনের অভ্যেস। মজা হয়, হাতি যখন হঠাৎ শুঁড় দিয়ে কাউকে জড়িয়ে ধরে নিজের পিঠে বসিয়ে নেয়।

হাতি যতই বাধ্য হোক, তাকে সব সময় সমঝে চলা উচিত। কখন কী কারণে যে তার মেজাজ বিগড়ে থাকে বলা যায় না।

কাজিরঙ্গার সেই বিখ্যাত হাতি 'আকবরে'র কথা হয়তো অনেকেই জানেন। সবাই তাকে বেশ নিরীহ বলেই জানত। তবু সে ১৯৫২ সালে তার মাহুতের সহকারীকে হঠাৎ মেরে ফেলল। আকবর যে কোনদিন কাউকে খুন করতে পারে, এটা ছিল সকলের ধারণার বাইরে। অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত লোকটাকে মারবার কারণ জানা গেল। আকবরকে নাকি সে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে খুব হয়রান করেছিল; তারপর আকবর যখন রাস্তার ধারের কলাবাগান থেকে কলা চুরি ক'রে খাওয়ার মতলব করে, লোকটা তার সে-সাধে বাদ সাধে। তারই ফলে রাগ সামলাতে না পেরে আকবর তাকে খুন করে।

আর এক কাণ্ড হয়েছিল ১৯৪৪ সালে সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে চিড়িয়াখানার এক হাতি একজন মেয়েকে ধরে খেয়ে ফেলেছিল। তাকে খেতে কেউ দেখেনি। কিন্তু তবু সন্দেহ ক'রে হাতিকে মেরে ফেলে তার পেট কেটে পাওয়া গেল মেয়েটির হাত-ব্যাগ আর মাথার টুপি।

মাহুতের অসাক্ষাতে হাতির কাছে গিয়ে তাকে কিছু খাওয়ানো বা হুকুম করা উচিত নয়। তাতে তার মেজাজ হঠাৎ বিগড়ে যেতে পারে।

এক মাহুতের বাধ্য বলে হাতি আরেকজনের কথা শুনে চলবে না। সেইজন্মে মাহুতের সঙ্গে থাকে একজন ক'রে সাকরেদ। সচরাচর এই দু'জনকেই সে মানে। নতুন কোনো মাহুত আনলে তাকে সে চট ক'রে বরদাস্ত করবে না। বেশি জোর করতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। হাতির যে রকম মেজাজ, তাতে তাকে মোটেই ঘাঁটানো উচিত নয়।

হাতির সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় এক সাহেবের থোঁতা মুখ এমন ভোঁতা হয়েছিল যে কী বলব! ফোতো সাহেবটি এক সময়ে ছিলেন বর্মা মুলুকে। ফলে, বর্মার মাহুতদের মুখের কিছু কিছু বুলি তাঁর জানা ছিল। মাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেইসব বুলি ঝেড়ে হাতিকে তিনি হুকুম করতে আরম্ভ করলেন; তাঁর ভাবখানা, আশপাশে সবাই তাঁর বিদ্যের বহর দেখুক। হাতি কিন্তু তাঁকে কোনো পাত্তাই দিল না। তাতে সাহেবের মান খোয়া যায়। কাজেই তিনি হাতিকে মানাবার জন্মে গলা পঞ্চমে চড়িয়ে ক্রমাগত সেইসব বুলি আওড়াতে থাকলেন। হাতিও ততক্ষণে তিতিবিরক্ত। হঠাৎ সে এক কাণ্ড ক'রে বসল। শুঁড় দিয়ে মেঝে থেকে একতাল লাদ কুড়িয়ে ধাঁই ক'রে সাহেবের দিকে ছুঁড়ে মারল। আরেকটু হলেই সেই বিশ্রী জিনিসটা সাহেবের হাঁ-মুখে পড়ত। কাছাকাছি যে যেখানে ছিল তখুনি দে-দৌড়।

সার্কাসে বা চিড়িয়াখানায় গিয়েও তাই হাতি সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকতে হয়।

কী বিরাট শক্তিধর জীব এই হাতি! দেড়শো জন কুলি কিংবা দু'তিনটে বুলডোজার বা ট্র্যাক্টরের কাজ সে একাই করবে। দু'টো হাতি মিলে চার টন মাল অনায়াসে টানতে পারে; এমন কি দরকার হলে একটা হাতি আড়াই টন অবধি মাল টেনে ওপরে তুলতে পারে। বর্মায়, দক্ষিণ ভারতে এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি জায়গার কাঠ-গোলায় কাঠ গাদা করার সময় হাতির এই প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

রাত্রে হাতিদের খাওয়ার জন্য জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর সকালে গিয়ে মাহুতরা এদের ফিরিয়ে আনে।

গাছ কাটার পর বড় বড় গুঁড়িগুলো টেনে এনে গাদা করা কিংবা দরকার মতো নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া—হাতিরা এই সব কাজ এত নিপুণভাবে করে যে, দেখলে অবাক হতে হয়।

শুধু গায়ের জোরে নয়, রীতিমতো মাথা খাটিয়ে হাতিকে এসব করতে হয়। পাহাড়ী নদীতে সারবন্দী কাঠ চলতে চলতে আটকে গেলে হাতিরা তখুনি একনজরে বুঝে ফেলে, ঠিক কোন্ কাঠটি এই অচলাবস্থার জন্যে দায়ী। তখন তাড়াতাড়ি সেই কাঠটি সরিয়ে নড়িয়ে দিয়ে নদী-পথে আটকানো কাঠের মিছিলকে আবার গতিশীল করে। কাঠগুলো আবার যেই চলতে আরম্ভ করে, তখন নাকি হাতির মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব ফুটে ওঠে।

ভালো ভালো কাঠের গোলায় হাতিদের কখনোই এক নাগাড়ে বেশি খাটানো হয় না। কেননা, অতিরিক্ত খাটালে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের খাটবার ক্ষমতা চলে যায়। হাতিরা প্রচণ্ড গরমে—বিশেষ ক'রে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের কড়া রোদে—সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। তাই এই সময়টা তাদের কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হয়। তারপর গরম কমে এলে দিনে চার ঘণ্টা এবং ঠাণ্ডা পড়ে এলে ক্রমশ কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে আট ঘণ্টা করা হয়। তাও কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম কখনোই সপ্তাহে পাঁচদিনের বেশি নয়।

মাল বহার কাজে হাতিকে বেশি কিছু তালিম দেওয়ার দরকার

হয় না। শোভাযাত্রায় বার করবার জন্যে হাতিদের তৈরি ক'রে নিতেও খুব বেশি সময় লাগে না। তার জন্যে দরকার শুধু আদেশ মান্য করতে শেখানো। এ রকম হাতিরও কিন্তু মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে যেতে দেখা যায়।

আমাদের রাষ্ট্রপতির একটি হাতি ছিল ; নাম তার 'উদয়গিরি'। ১৯৬২ সালে দিল্লী থেকে মুজফ্ফরনগর—এই দীর্ঘ পথ তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ওপর রাস্তার দু'পাশের ভিড়ে আর হট্টগোলে বেচারা মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিল। ফলে, তখুনি তাকে গুলি ক'রে মারা হয়।

শিকারের হাতির কয়েকটা বিশেষ গুণ থাকা দরকার। গায়ের জোর, মনের জোর—এসব তো থাকবেই। সেইসঙ্গে থাকতে হবে সহ্যশক্তি। শিকারের হাতি যেন কখনই নিজের খেয়ালমতো কিছু ক'রে না বসে। দাঁতলা হাতিদের মধ্যে এইসব গুণ বেশি থাকে। হস্তিনীরাও শিকারে খুব কাজে লাগে।

কাছাকাছি বাঘ থাকলে শিকারের হাতিরা ঠিক বুঝতে পারে। তীক্ষ্ণ শব্দে অথবা শুঁড় কিংবা সামনের পা মাটিতে ঠুকে শিকারীকে সে বাঘের কথা জানিয়ে দেয়। শিকারের ভাষায় একে বলে 'বোখারা' আর 'ঠোক্কর'। এটা শোনা মাত্র বাঘের মহড়া নেবার জন্যে শিকারী তৈরি হয়ে যান। বাঘ লাফ দিয়ে শিকারীকে ধরবার চেষ্টা করলে হাতি অনেক সময় তাঁকে বাঁচায়। শুঁড় অথবা সামনের পা দিয়ে বাঘকে ঝেড়ে ফেলে পায়ের নিচে থেঁতলে মারে।

প্রদর্শনী বা সার্কাসের জন্যে হাতিকে তৈরি করা কম মেহনতের ব্যাপার নয়। আর সময়-সাপেক্ষও বটে! এর জন্যে হাতিকে রীতিমতো মার খেতে হয়। শেখানোর পর ভুলে গেলে কিংবা ভুলচুক করলে মেরে মেরে তাকে শেখাতে হবে। তার মনের মধ্যে এটা গেঁথে দিতে হবে যে, মানুষ তার মনিব। তাকে আগাগোড়া হুকুম-মাফিক চলতে হবে। তার যেন নিজের কোনো মর্জি না থাকে।

হাতি ঠিক দুরস্ত হয়েছে কিনা এটা বুঝতে বেশ সময় লাগে।

তাকে চট ক'রে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কেননা, অনেক সময় সে এমন ভান করে যেন কত বাধ্য। কিন্তু হয়তো পরক্ষণেই শিক্ষাদাতাকে বাগে পেয়ে মেরে ফেলে। তাকে মেরে মেরে এটা বুঝিয়ে দিতে হয় যে, এ বড় শক্ত ঠাঁই—এখানে কোনোরকম চালাকি চলবে না। হাতিকে শিক্ষা দিতে গেলে রীতিমতো কড়া হতে হবে। তাহলে পরে সে ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে না। হাতিকে বেশ ভালো রকম মার দিয়ে শেখাতে হবে, নইলে ছোটখাটো মার মনে রেখে সে শিক্ষকের উপর প্রতিহিংসা নিতে পারে। কিন্তু একবার যদি সে বুঝতে পারে যে, তার এই শিক্ষক কি ধরনের লোক এবং তাঁকে অমান্য করা যায় না, তাহলে সে প্রহার ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেয়। আবার যদি সে কথা শুনে চলে তাহলে তাকে আদর করতে হবে এবং খাবার দিয়ে খুশি করতে হবে।

হাতি যখন পুরোপুরি দুরস্ত হবে এবং শিক্ষাদাতার কাছে নিজেকে সঁপে দেবে, তখন শুঁড় দিয়ে তাকে শুঁকবে এবং গায়ে শুঁড় বুলিয়ে আদর জানাবে। হাতি যে একজনকে মানলেই আরেকজনকে মানবে তার কোনো মানে নেই। তাকে শেখাতে শেখাতে একজন যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে সে জায়গায় নতুন লোক এসে হঠাৎ বিপদে পড়তে পারে। কেননা, আগের লোক তাকে কতদূর কিভাবে শিখিয়েছে তা তো তার জানা নেই।

মনে রাখতে হবে, স্বভাবে এবং বুদ্ধিতে সব হাতি সমান নয়। সেইমতো তার সঙ্গে ব্যবহারেরও তারতম্য করতে হবে। সার্কাসের হৈ-হট্টগোলে কোনো কোনো হাতি হঠাৎ ক্ষেপে যেতে পারে।

সার্কাসের হাতিকে মেরে ধরে কত কষ্ট ক'রে যে খেলা শেখানো হয়, সার্কাস দেখবার সময় সেটা মনে রাখা উচিত।

হাতি সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। একবার এক হাতি তার মাহুতকে মেরে ফেলেছিল। কেন? না, মাহুত সেই হাতিটির খাবার সমানে চুরি করত। হাতি একবার একজনকে পা দিয়ে থেঁতলে

মেরে ফেলেছিল। কারণ কি? না, লোকটা সেই হাতির শুঁড়ে সুচ ফুটিয়ে দিয়েছিল। ফ্লোরিডায় এক চিড়িয়াখানায় হাতি পাঁচ-ছ বছর বয়সের একটি ছেলেকে পায়ের নিচে ফেলে থেঁতলে মেরেছিল। কেন? না, দর্শকদের দেওয়া হাতির চিনেবাদাম সে খেয়ে নিত।

এসব গল্পের অনেকটাই সত্যি।

অপকার করলে যেমন, তেমনি উপকার করলেও হাতি খুব মনে ক'রে রাখে।

আমি একবার বনবিভাগের একটি হাতিতে চড়ে শিকারে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে খুশি হয়ে তাকে এককাঁদি কলা খেতে দিয়েছিলাম। তারপর পাঁচ বছর কেটে যাবার পর আবার সেখানে গেলে তার সঙ্গে দেখা। আমি কাছে যাওয়ামাত্র আমাকে চিনতে পেরে সে আমার গায়ে শুঁড় বুলিয়ে দিল।

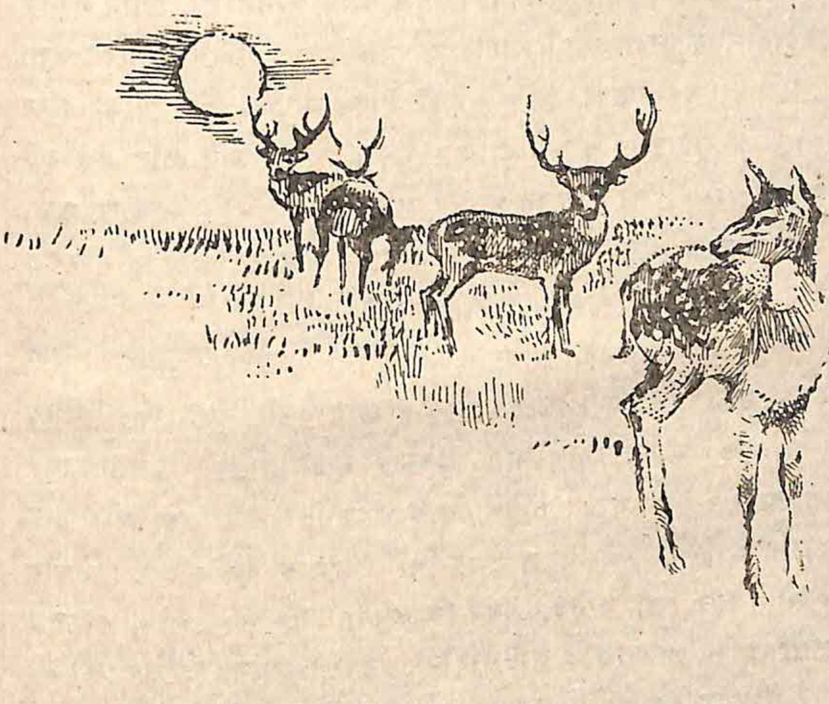
পোষা হাতি নিজের থাকার জায়গা অতি সহজেই চিনতে পারে, মাহুত ছাড়াই সেখানে সে ফিরে আসে।

শোনা যায়, এক মাকনা হাতি ন'মাস জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে এবং এক পলাতক হাতি পাঁচ বছর পর নিজের নিজের ডেরায় ফিরে এসেছিল। একবার তালিম দিতে পারলে হাতি যে অনেকদিন মনে ক'রে রাখে, একটি হাতি পালানোর চোদ্দ বছর পর ধরা পড়ে গিয়ে তার প্রমাণ দেয়। সেবার সে ধরা পড়েছিল 'মেলা-শিকারে'। তার পায়ে দেখা গেল মরচে-ধরা ভাঙা শেকলের একটা টুকরো তখনও ঝুলছে। তাকে 'বৈঠ' বলা মাত্র শিক্ষিত হাতির মতো সঙ্গে সঙ্গে সে হুকুম-মাফিক বসে পড়ল।

কেবল মস্তির সময় সব শিক্ষাদীক্ষা সে ভুলে যায়। তখন যেন তাদের মাথায় পাগলামির ভূত চাপে।

দুর্জন লোকের হাতে পড়ে হাতি যে কি ক'রে মানুষের অসৎ কাজের সাথী হয়ে পড়ে, তার এক মজার খবর পাওয়া গিয়েছিল বর্মা থেকে। জন কয়েক লোক বেআইনী আফিমের চোরা-চালানে লিপ্ত ছিল। পাঁচ ছ'টি হাতিকে তারা এমনভাবে শিখিয়ে দুরস্ত করেছিল

যে, মাহুত ছাড়াই তারা নিজেরা গভীর জঙ্গল ভেঙে যথাস্থানে মাল খালাস ক'রে আসতে পারত। চোরাচালানীর দল অনেকখানি তফাতে থেকে বাঁশিতে সংকেত ক'রে তাদের জানিয়ে দিত যে কখন এগিয়ে যেতে হবে, কখন থামতে কিংবা কখন গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে হবে। পরে এই দল ধরা পড়ে যায় এবং তার ফলে গুলি খেয়ে দলের কয়েকটি হাতি সঙ্গদোষে অনর্থক মারা যায়।



হরিণ···

শম্বর

আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় আকারের হরিণ বলতে সাধারণত বোঝায় শম্বরকে।

শম্বর অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের রঙ একটু কালচে ধরনের গাঢ় বাদামী। ঘাড় আর গলার ঘন লোম লড়াই করার সময় ফুলে ওঠে। সাধারণত বড় মদ্দা হরিণের পায়ের তলা থেকে ঘাড়ের উচ্চতা চার ফুট আট ইঞ্চির মতো। এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে ছ' ফুট আর ওজনে প্রায় ছ' মন। লোমে ভর্তি প্রায় এক ফুট লম্বা ল্যাজ। সব শম্বরের গায়ের রঙ একরকম নয়; তাছাড়া ঋতু-বদলের সঙ্গে সঙ্গে এদের রঙও বদলায়। পায়ের ভিতরের দিকের রঙ একটু হলদে ধরনের হালকা বাদামী।

শুধু মদ্দা শম্বরের শিং হয়। এদের শিং দেখবার মতো। দু'টি ছোট, দু'টি বেশ বড়। শেষের দিকে দু' ভাগ করা। দু'টো শিং মিলিয়ে সাধারণত ছ'টি ডালপালা। কখনও কখনও এর একটু-আধটু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি লম্বা আর তার ব্যাস আট-ন' ইঞ্চি হলে সেই শিং ভালোই বলতে হবে। লম্বায় পঞ্চাশ ইঞ্চি তো বটেই, এমন কি একান্ন ইঞ্চি শিং-ও দেখা গেছে। শম্বরের শিং গোলাকৃতি, গাঢ় বাদামী, খসখসে, শেষের দিকে সাদাটে। বড় শম্বরের শিং একটু পাকানো গোছের, কিন্তু ছোটদের শিং মসৃণ।

প্রতি বছর মার্চ বা এপ্রিলে এদের শিং খসে যায়। নতুন শিং আবার গজাতে আরম্ভ করে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। নতুন গজাবার সময় নরম মখমলের মতো চামড়ায় (যাকে 'ভেলভেট' বলা হয়) মোড়া থাকে। এসময় শম্বর-শিকার নিষিদ্ধ। অক্টোবর থেকে এরা জঙ্গলের ছোট নরম গাছে ঘষে ঘষে শিং-এর ভেলভেট ওঠাতে চেষ্টা করে। ভেলভেট উঠে গেলে ডিসেম্বরে নতুন শিং সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

এ ধরনের খসে-পড়া শিং জঙ্গলে অনেক পড়ে থাকতে দেখা যায়। মে থেকে ডিসেম্বর—নতুন শিং গজানোর এই সময়টাতে শম্বর সাবধানে একা একা থাকে। পাহাড়ের ওপর খোলা ঘাসের জায়গাই তখন তার পছন্দ। কারণ, এমনিতে সে গভীর বনে থাকতে ভালোবাসলেও—শিং শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঘা লেগে ভেঙে যাওয়ার ভয়ে তাকে ডালপালার ঘন জঙ্গল এড়িয়ে চলতে হয়। শক্ত হওয়ার আগে তার শিং-এর ডগাও একটু নরম থলথলে থাকে।

গরমের সময় শম্বরের গায়ের লোমও পড়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে নতুন লোম গজায়।

এ সময় তাদের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। বেচারাদের না আছে শিং, না আছে লোম! দেখে মনে হয়, তারা কত ছোট হয়ে গেছে। নতুন লোম গজাতে দেরি হয় না। অথচ শম্বরের ঘাড়ের কাছে সাধারণত যে ঘা থাকে, সেটা কিন্তু থেকেই যায়। ঘা হওয়ার কারণটা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি।

ডিসেম্বর মাস হল স্ত্রী-পুরুষ শম্বরের জোড় বাঁধার সময়। তাদের বেশির ভাগ বাচ্চা বর্ষার কিছু আগে জন্মায়। বাচ্চা তার মার সঙ্গে দু' বছর বয়স পর্যন্ত থাকে। প্রায় তিন বছর পর পর স্ত্রী-শম্বরের বাচ্চা হয়।

অনেক জাতের হরিণ আছে, তারা তাদের বিরাট পরিবার সামলাতেই সব সময় ব্যস্ত। একগাদা স্ত্রী-হরিণ আর তাদের কাচ্চাবাচ্চা সঙ্গে নিয়ে তারা চলাফেরা করে। এতগুলো স্ত্রী-হরিণ থাকায় পুরুষ-হরিণকে প্রায়ই অন্য পুরুষ-হরিণদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

কিন্তু গভীর জঙ্গলে থাকে যে শম্বর, তার এসব বালাই নেই। সে লড়ে জমি দখলের জন্যে, জঙ্গলে তার আধিপত্যের জন্যে। পুরুষ আর স্ত্রী-শম্বরের জোড় বাঁধার সময়কাল খুব দীর্ঘ নয়। তারপর দলপতি পুরুষ-শম্বর একা একা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। আর স্ত্রী-শম্বরদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় বাচ্চা শম্বরের দল।

বাঘ বা বন্য কুকুর কিংবা শিকারী মানুষের পাল্লায় না পড়লে শম্বর অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচে। ঠিক কতদিন যে বাঁচে তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

অনেকখানি মাংস পায় বলে বাঘের প্রিয় খাদ্য শম্বর। বন্য কুকুরের দল মাইলের পর মাইল দৌড়ে শেষ পর্যন্ত শম্বরকে ধরে ফেলে পেট চিরে জ্যান্ত অবস্থাতেই তাকে খেতে আরম্ভ করে।

শম্বরের এত দিকে এত শত্রু থাকা সত্ত্বেও সমানে যে তার বংশ বৃদ্ধি হয়, তার কারণ, শম্বর খুব সাবধানী জীব। জঙ্গলে সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলে।

রাত্তিরে ছাড়া এরা এমন জায়গায় যায় না যেখানে গাছপালার তেমন আড়াল নেই। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা গভীর জঙ্গলে ফিরে যায়।

দিনের বেলায় তারা থাকে গুহার মধ্যে, বড় পাথরের নিচে কিংবা নালার পাশে ঘন জঙ্গলে। সন্ধ্যে হলেই এরা চরবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লেও তারা চায় অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে থাকতে। চাঁদনী রাতে তারা কিছুতেই খোলা জায়গায় বেরোবে না। এরা জংলী রাস্তা বা 'ফায়ার-লাইন' লাফিয়ে পার হয়।

খুব বড় শম্বর চাষীর ক্ষেতে ঢোকে না ; স্ত্রী-শম্বর বা ছোট পুরুষ-শম্বর হলে অন্ধকার রাতে চাষের ক্ষেতে মাঝে মাঝে চরতে যায়। তবে জায়গাটি জঙ্গলের ঠিক ধারেই হওয়া চাই।

দল বেঁধে চলবার সময় স্ত্রী-শম্বরেরা থাকে সবার আগে। পুরুষ-শম্বরেরা যায় তাদের পেছন পেছন। শম্বরের দল জঙ্গলে চলাফেরা করে অতি সন্তর্পণে, একটুও শব্দ না ক'রে। যখন প্রচণ্ড দৌড় দেয়, তখনও খুব কম শব্দ করে ; ছোটবার সময় তারা কখনই অন্য হরিণদের মতো পেছন ফিরে তাকায় না।

জঙ্গলে এরা সদা-সতর্ক। এদের নাক আর কান খুবই প্রখর। গভীর জঙ্গলে থাকে বলে এদের দৃষ্টিশক্তি মাঝারি ধরনের। বাঘ কিংবা চিতা দেখলে এদের গলা দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ

বেরোয়—ঢ্যাঙ্। সেই আওয়াজ শোনামাত্র বনের পশু-পাখিরা হুঁশিয়ার হয়।

মানুষ দেখলে এরা একবার হাঁক দেবে, চিতা দেখলে দু'তিনবার; কিন্তু বাঘ দেখলে অনবরত ডাকতে থাকবে। বিপদের কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলে 'পুক্ পুক্' ক'রে এরা এক ধরনের আওয়াজ করবে। বাঘও কম শয়তান নয়। তারাও কখনও কখনও অজ্ঞাত কারণে এই আওয়াজ নকল করে। এই শব্দের ফাঁদে পা দিলে শম্বরদের মহা বিপদ দেখা দেয়।

পুরুষ-শম্বর শীতকালে জলায় কিংবা নদীর ধারে কাদায় গড়াগড়ি দিতে ভালোবাসে। এতে বোধ হয় শীত কম লাগে। আর মশা-মাছি পোকা-মাকড়ের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। ভোর বেলায় এদের কখনও কখনও জলে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে দেখা যায়। চারিদিকের হাওয়ার চেয়ে তখন জল গরম থাকে বলেই তারা বোধহয় এই রকমটি করে।

যেমন একই নরম গাছে তারা শিং পরিষ্কার করতে ভালোবাসে, তেমনি একই কাদার গর্তে গড়াগড়ি দেয়। নিষ্ঠুর চোরা শিকারীরা জেনে-শুনে এর পূর্ণ সুযোগ নেয়। হন্যে কুকুরের মতো তারা মাংস আর চামড়ার লোভে কাদা আর নোনা মাটিতে এবং জল খাওয়ার জায়গায় ওৎ পেতে বসে থেকে শিকার করে।

শম্বরের মাংস খুব সুস্বাদু না হলেও খেতে ভালো। জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে এর চামড়ার বেশ চাহিদা আছে।

কিন্তু প্রকৃত শিকারীর কাছে শম্বরের কদর তার শিং-এর জন্যে। শম্বর মারা রীতিমতো পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুআরীর মাঝামাঝি—এই সময়ের মধ্যে খুব ভোর বেলায় বেরিয়ে ঘোর সন্ধ্যে পর্যন্ত জঙ্গল ঢুঁড়তে হবে। হাতির পিঠে চড়ে কিংবা বীটের সাহায্যে সাবধানে শম্বর মারতে হয়। সুবিধে এই যে, হাতি দেখলে হরিণ ভয় পায় না।

১৯৫৬ সালে মধ্যপ্রদেশে একবার এরকম একটি বীট হয়েছিল।

দুপুর বেলা ; আমি আর আমার এক আদিবাসী সঙ্গী একটি গাছের ডালে বসে। আমার গায়ে অলিভগ্রীন পোশাক। খানিকক্ষণ পরে গাছটির দশ ফুট দূরে একটি পুরুষ-শম্বর, স্ত্রী-শম্বর আর শম্বর-শিশু এসে হাজির। পুরুষ-শম্বরটি বেজায় হাঁদা ; চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রী-শম্বরটি কিন্তু ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। হয়তো আমাদের গন্ধ পেয়েছে ; তার নাকের ডগা কাঁপছে। এদিকে আমরা এমনভাবে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছি যে, তারা আমাদের ঠাহর করতেই পারছে না। প্রায় আট মিনিট ধরে এমনি ক'রে আমরা নিশ্চল হয়ে আছি। মাংসলোভী আদিবাসী আমাকে চিমটি কেটে প্রায় রক্ত বার ক'রে দিয়েছিল। আমি নিশ্চল। হাতে রাইফেল তৈরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমন প্রাণীদের চোরের মতো গুলি ক'রে মারতে আমার কিছুতেই হাত উঠল না। এরকম অপূর্ব দৃশ্য নষ্ট করতে চাইলাম না রাইফেল চালিয়ে। এত কাছে এসে শম্বর যে আমাদের চিনতে পারল না, এটাই শিকারীর আনন্দ ও গর্ব।

বারশিঙ্গা

শম্বরের চেয়ে ছোট। কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। বারশিঙ্গা হরিণ। সাধারণত এদের থাকে বারোটি ডালপালাওয়ালা শিং। নামও তাই 'বারশিঙ্গা'। কারো সামান্য কম, কারো অনেক বেশি—এমনও দেখা যায়। এই সংখ্যা নিচের দিকে দশ আর ওপরের দিকে বিশটিও হয়ে থাকে। দু'দিকে ছড়ানো এই শিং-এর কী বাহার! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তেত্রিশ ইঞ্চি লম্বা শিং বেশ ভালো ; আর একচল্লিশ ইঞ্চি লম্বা শিং—তাও কখনও কখনও দেখা যায়।

এদেশে এরা থাকে প্রধানত উত্তর প্রদেশে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে, আসামে আর মধ্যপ্রদেশে। তরাই অঞ্চলের আর মধ্য-প্রদেশের (বিশেষতঃ মাণ্ডলা, বালাঘাট আর বিলাসপুর জেলার)

বারশিঙ্গা একই জাতির হলেও, জায়গা-ভেদে তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। বারশিঙ্গার ইংরেজি নাম 'সোয়াম্প ডিয়ার'—অর্থাৎ জলা জায়গার হরিণ। তরাইয়ের ক্ষেত্রে এ-নাম খুবই উপযুক্ত। কারণ, ঐ অঞ্চলের বারশিঙ্গার দল জলা জায়গাই পছন্দ করে বেশি। চরবার জন্যে জলে-ডোবা ঘাসের মাঠ আর বিপদে বাঁচবার জন্যে কাছেই ঘন জঙ্গল এদের চাই। কি ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই জলে এরা থাকে ভাবতেও অবাক লাগে। জলকাদায় থাকার ফলে এদের পায়ের তলা একটু থেবড়ে যায়। এদিকে মধ্যপ্রদেশের শক্ত মাটির ঘাসের জমিতে যে সব বারশিঙ্গা (স্থানীয় ভাষায় 'গোয়েন') থাকে, পাথুরে জমিতে দৌড়তে হয় বলে তাদের পায়ের ক্ষুর শক্ত আর ছোট।

দু' ধরনের বারশিঙ্গাই খোলামেলা মাঠে-ময়দানে থাকতে ভালো-বাসে। তরাই অঞ্চলে যারা থাকে তাদের শিং সাদাটে—তাতে চক-চকে ভাব। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বারশিঙ্গাদের শিং খড়খড়ে, কালচে, শেষের দিকটা সাদা। এমনিতে গায়ের রঙ বাদামী, তবে মধ্যপ্রদেশের বারশিঙ্গার রঙ একটু গাঢ়। বারশিঙ্গা হরিণদের ঘাড়ে ছোট কেশরের মতো লোম আর পিঠের ওপর কালচে লম্বা দাগ। এদের পেটের আর ল্যাজের নিচের দিকের রঙ একটু হরিদ্রাভ বাদামী। গরমকালে এদের রঙ একটু বদলে যায়। বারশিঙ্গা হরিণদের গায়ের রঙ হয় লালচে বাদামী আর হরিণীদের হরিদ্রাভ বাদামী। এই সময় এদের শরীরের জায়গায় জায়গায় ফুট-ফুট দাগ দেখা যায়। দাগগুলো সাদা নয়, কেবল একটু বেশি ফিকে বাদামী। একেবারে বাচ্চা অবস্থায় চিতল হরিণের মতো এদের গায়ে সাদা দাগই থাকে।

বারশিঙ্গা হরিণীদের শিং নেই। তারা দেখতে ছোট এবং মদ্দাদের তুলনায় অত্যন্ত সাদাসিধে। সাধারণ বড় বারশিঙ্গা হরিণের ওজন প্রায় পাঁচ মন। এই হরিণদের শিং পড়ে যায় প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিলে। শম্বরের মতোই আস্তে আস্তে আবার নতুন শিং গজিয়ে ওঠে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। এরা কিন্তু গাছের গায়ে ভেলভেট ঘষে শিং পরিষ্কার করে না। করবেই বা কি ক'রে ? যা ছড়ানো শিং ! তাই আগাছার

ঝোপে এরা শিং পরিষ্কার ক'রে নেয়। শম্বরের মতো বারশিঙ্গা হরিণেরা শীতকালে কাদায় গড়াগড়ি দিতে ভালোবাসে।

একেকটি বারশিঙ্গা হরিণ একসঙ্গে অনেক হরিণী নিয়ে থাকে। বারশিঙ্গা হরিণদের মধ্যে লড়াই হয় হরিণী নিয়ে; শম্বরের মতো এলাকার আধিপত্য নিয়ে নয়। হরিণ-হরিণীর জোড় বাঁধার সময় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুআরির মাঝামাঝি পর্যন্ত। এদের যত হাঁক-ডাক আর লড়াই এই সময়। গরম কালের শেষাশেষি এদের বাচ্চা হয়। শেষ পর্যন্ত বারশিঙ্গা দলের যারা সেরা পুরুষ-হরিণ, তারা আট-দশটিতে মিলে নিজেরাই চরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়, সে হয়তো একা একা, কিংবা সঙ্গে বড় জোর আর একটি হরিণ নিয়ে চলাফেরা করে। ছোট পুরুষ হরিণেরা পুরনো দলেই থেকে যায়।

শম্বরের মতো এরা নিশাচর নয়। সকাল ন'টা পর্যন্ত এদের দেখা যাবে ; আবার বিকেল তিনটে থেকে চরতে শুরু করবে। প্রায়ই এদের পিঠের ওপর ছোট ছোট পাখি এসে বসে—এদের গায়ের পোকা খাওয়ার জন্যে। শম্বরদের মতো এরা চুপচাপ থাকে না। একজন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলে দলের সবাই তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চিৎকার জুড়ে দেবে।

এদের শত্রু বাঘ আর বন্য কুকুর। শম্বরের মতো সাবধানী নয় বলে এরা প্রায়ই বাঘের হাতে মারা পড়ে। কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলে এরা মানুষের হাতেও সহজেই শিকার হয়। এরা অনেক সময় মারা পড়ে স্বভাবদোষে। তাড়া খেয়ে কোথায় সটান পালাবে তা নয়—এরা মাঝে মাঝে থেমে দেখবার চেষ্টা করে। তার ফলেই বাঘের হাতে এরা ধরা পড়ে যায়।

শিকারীরা খুব সকালে উঠে পায়ে হেঁটে কিংবা হাতি বা ঘোড়ার পিঠে চেপে বারশিঙ্গার খোঁজে লম্বা ঘাসের জঙ্গলে ঢোকে। এর জন্যে অবশ্য বীটের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যেখানে এরা নুন বা জল খায় কিংবা কাদায় গড়াগড়ি দেয়, চোরা-শিকারীরা সেখানে হানা দিয়ে এদের শিকার করে। কিন্তু এদের জন্মের হার বেশি বলে এত বিপদেও এদের বংশ উজাড় হয় না।

চিতল বা চিত্রা

শম্বর আর বারশিঙ্গার চেয়ে ছোট, কিন্তু দেখতে অপূর্ব সুন্দর এই চিতল হরিণ। এদের ইংরেজি নাম 'স্পটেড ডিয়ার'। এদের গায়ের রঙ লালচে বাদামী ; সারা গায়ে সাদা ফুট-ফুট দাগ। পিঠের ওপর টানা টানা কালচে আঁচড় ; গলা, শরীরের নিচের অংশ, পায়ের আর ল্যাজের ভেতর দিক সাদা।

শুধু পুরুষ-চিতলের শিং থাকে। শিং লালচে বাদামী ; একেক-দিকের শিং-এ তিনটি ক'রে ডালপালা। অবশ্য কখনও কখনও বেশি ডালপালাও থাকতে পারে। এদের শিং পেছন দিকে একটু হেলানো হয়। শিং যদি বত্রিশ থেকে ছত্রিশ ইঞ্চি লম্বা এবং তার ব্যাস যদি পাঁচ ইঞ্চি হয়, তাহলে সেই শিং বেশ ভালো বলতে হবে। অবশ্য এদের মধ্যে উনচল্লিশ ইঞ্চি লম্বা শিং-ও দেখা গেছে। ঋতুবদলের ফলে এদের গায়ের রঙ বিশেষ বদলায় না। পুরুষ চিতলের মাথায় থাকে V-এর মতো চিহ্ন এবং একপ্রকার কালো দাগ। এই দাগ নাকের উপরের দিকেও দেখা যায়। পায়ের তলা থেকে ঘাড় পর্যন্ত ছত্রিশ ইঞ্চি উঁচু আর ওজন সোয়া দু'মন হলে সেই চিতল বেশ ভালো। মধ্যপ্রদেশ আর তরাই অঞ্চলের চিতল আকারে বড় হয়।

১৯৬৯ সালে আমরা উত্তর প্রদেশের বাঁদা জেলায় একটি প্রকাণ্ড চিতল হরিণ দেখেছিলাম, তার ওজন চার মনের কম নয়। কিন্তু চিতল মারা সেখানে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল বলে হরিণটি বেঁচে গেল। সুন্দরবন বা উত্তরবঙ্গের চিতল হরিণ আকারে একটু ছোট হয়।

ভারতের বহু অংশে এই হরিণ দেখা যায়। পঞ্জাব, রাজস্থান কিংবা আসামের গভীর জঙ্গল এলাকায় এদের পাওয়া যায় না। পাহাড় বা ঘন বনের চেয়ে সমতলের পাতলা জঙ্গল এদের বেশি পছন্দ। কাছাকাছি জল থাকা চাই। কারণ, এদের দিনে দু'বার জল খাওয়া দরকার। গ্রীষ্মে জলের অভাব দেখা দিলে যত দূরেই হোক, এরা নদী আর খালের কাছে চলে যায়। এদের দেখাদেখি বাঘও তার আস্তানা বদলায়।

দল বেঁধে থাকতে এরা ভালোবাসে। বিশ, ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিংবা তারও বেশি চিতল একেক দলে থাকে। তার মধ্যে মাত্র আট-দশটি হয়ত শিংওয়ালা। দলের সেরা পুরুষ-হরিণটি বারশিঙ্গার মতো হরিণী জুটিয়ে দল ভারী করতে ব্যস্ত থাকে। তার জন্যে হরিণদের মধ্যে কম লড়াই হয় না। এদের মধ্যে হরিণ-হরিণীর জোট বাঁধার সময় এপ্রিলের শেষাশেষি থেকে মে মাসের গোড়া পর্যন্ত। প্রায় প্রতি বছরই স্ত্রী-চিতলের দু'টি তিনটি ক'রে বাচ্চা হয়। ছোট হরিণ-ছানাদের গায়ে গন্ধ থাকে না বলে অনেক সময় তারা শেয়াল আর হায়েনার হাত থেকে বেঁচে যায়; কিছুদিন পর যখন তাদের গায়ে গন্ধ হতে আরম্ভ করে, তখনই তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি শুরু হয়।

প্রতি বছরই অগস্ট-সেপ্টেম্বরে এদের শিং পড়ে যায়। তারপর নতুন শিং গজাতে থাকে। ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ভেলভেটে ঢাকা থেকে, ফেব্রুআরির শেষে কিংবা মার্চ মাসে পূর্ণ আকার পায়।

চিতল যেমন জল ভালোবাসে, তেমনি নোনা মাটি ('সল্ট লিক') চাটতে সে সব সময় রাজী। চোরা-শিকারীর দল চিতলের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তাদের শিকার করে।

রাত্রে এরা ফসলের জমিতে চরতে যায়। চাষীরা তখন বন্দুক চালিয়ে এবং আরও নানা নৃশংস উপায়ে তাদের মারে। জমির বেড়ার একদিকে একটু ফাঁক রেখে সেখানে বাঁশ বা কাঠের গোঁজ বর্শার মতো তীক্ষ্ণ ক'রে পুঁতে দেয়। তার ওপর চিতল লাফিয়ে পড়লেই, বস্‌ —সঙ্গে সঙ্গে সে তাতে গেঁথে যায়। কখনও কখনও ঐ রকম জায়গায় তাদের জাল পেতে ধরে তারপর খুঁচিয়ে বা পিটিয়ে মারা হয়।

সাধারণত লোকালয় আর ফসলের ক্ষেতের কাছেই চিতলের দল থাকে। মানুষকে তারা তত ভয় করে না বলেই তারা জনপদের অতটা কাছাকাছি থাকে। পুরুষ চিতলরা একটু অসাবধানী; প্রাণ-ভয়ে তারা সর্বদা শশব্যস্ত নয়। কিন্তু চিতল হরিণীরা সেদিক থেকে খুবই হুঁশিয়ার। এসব সত্ত্বেও অবশ্য বাঘ আর চিতার মুখে পড়লে প্রায়ই তাদের প্রাণ যায়।

বাঘ কিংবা চিতা দেখলে এরা সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ওঠে—'এ-ওন টেয়াওন'। সেই শুনে জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণী এবং শিকারীর দল ঠিক বুঝে নেয় হিংস্র মাংসাশী প্রাণী কাছেই আছে।

সকালে পায়ে হেঁটে শিকারীরা খুব বেশি কষ্ট না করেই চিতলদের পেয়ে যান। বিশেষত তারা যখন রাতের শেষে ফিরে আসে। সূর্য ওঠার ঘণ্টা দুয়েক পরও তাদের পাতলা জঙ্গলে চলতে ফিরতে দেখা যায়। বিকেলে আবার তারা চরতে শুরু করে।

মরে মরেও এরা যে শেষ হয়ে যায় না, তার প্রধান কারণ এদের জন্মহার খুব বেশি।

এই অপূর্ব সুন্দর প্রাণী জঙ্গলের পরম সৌন্দর্য। বেছে বেছে এঁরা থাকেও খোলামেলা পাতলা জঙ্গলের সবচেয়ে সুন্দর জায়গায়।

কাকর (কাকুর)

আমরা যাদের কাকর বা কাকুর বলি, ইংরেজিতে তাদেরই বলে 'বার্কিং ডিয়ার'। এরা সঙ্গোপনে আর সন্তর্পণে একই জায়গায় চলা-ফেরা করতে চায়। উচ্চতায় এরা সাধারণত হয় চব্বিশ ইঞ্চি থেকে আটাশ ইঞ্চি; ওজন পঁচিশ সের থেকে তিরিশ সের। কাকরের রঙ গাঢ় লালচে বাদামী; কিন্তু পেট, পায়ের আর ল্যাজের ভেতর দিকে এবং গলার ওপরের অংশ সাদা। কেবল মদ্দা হরিণের শিং থাকে; এ-জাতের হরিণীদের মাথায় শিঙের বদলে কালো চুলের প্যাঁচানো দু'টো দলার মতো থাকে। কাকর হরিণের মাথার দু'ধারে শক্ত কালো চুলে ঢাকা দু' ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি উঁচু বৃন্ত থেকে এদের শিং বেরোয়। এই বৃন্ত দু'টি হচ্ছে এদের বিশেষত্ব। বড় শিং দু'টি পাঁচ ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি লম্বা; প্রত্যেকটির সঙ্গে বৃন্তে জোড়া একটি ক'রে ছোট শিং। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিঙের ডগা একটু ভেতরের দিকে হেলানো।

মুখের মাঝখানে থাকে অদ্ভুত একটি লম্বা খাঁজ; তার দু' ধারে

চকোলেট রঙের মতো গাঢ় বাদামী রঙের উঁচু জায়গা। এটি এদের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। এদের আরেক বিশেষত্ব, ওপরের চোয়ালের দু'পাশে আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি লম্বা সুতীক্ষ্ণ দাঁত। দাঁত দু'টি নড়ে; এই দাঁত দিয়ে কাকর তার প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রুর সঙ্গে ভীষণভাবে লড়াই করে।

গ্রীষ্মে শিং পড়ে যায়; শীতের প্রথমে আস্তে আস্তে আবার তা গজিয়ে ওঠে। তারপর তাদের আসে হরিণ-হরিণীর জোড়বাঁধার সময়। একটি কি দু'টি বাচ্চা হয় পরের গ্রীষ্মে।

কাকর একলা থাকতেই ভালোবাসে, হয় একেবারে একা, নয় সঙ্গে আরেকটিকে নিয়ে। পাতলা জঙ্গল কিংবা ফাঁকা ময়দান এদের মোটেই পছন্দ নয়। গভীর বাঁশবন কিংবা ঘন জঙ্গল এদের প্রিয়; আর যদি সেখানে খাদ বা নালা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। একই জঙ্গলে কিংবা একই খাদের ধারে এরা বরাবর থাকে। অন্ধকার হলে তবেই চরতে বেরোয়। দৌড় দেবার সময় মাথা নিচু ক'রে ছোটে।

জঙ্গলের অতন্দ্র প্রহরী কাকর। ডাকে হাঃ হাঃ করে। বাঘ কি চিতা দেখলে (কখনও কখনও অদ্ভুত বেশে মানুষ দেখলেও) এরা খরর্ খরর্ শব্দ করে—যা কুকুরের ডাক মনে করিয়ে দেয়। এই ডাক শুনে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়াররা সাবধান হয়। এ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এরা বাঘ বা চিতার খোরাক হয়। এদের মাংস খুব সুস্বাদু বলে এদের ওপর শিকারীদের খুব লোভ থাকে। কিন্তু এদের মারা বেশ শক্ত।

'হ গ ডি য়া র' ঃ পা রা

'হগ ডিয়ার' হচ্ছে শম্বরের ছোট সংস্করণ। কিন্তু দেখতে ভালো নয়; এদের শিং ছোটও বটে, সরুও বটে। শিং আঠারো ইঞ্চি লম্বা হলে যথেষ্ট বড়। একেকটি শিং-এ তিনটি ক'রে ডাল। চিতলের চেয়ে এরা আকারে ছোট। কাকরের মতো মাথা নিচু ক'রে ছোটে। উত্তর ভারতে আর আসামে এদের দেখা যায়।

এদের রঙ গাঢ় বাদামী ; লোমের আগার দিক একটু ফিকে ধরনের ; গোড়ার দিকে সাদাটে। অনেকদিন পর্যন্ত এদের বাচ্চাদের গায়ে সাদা সাদা দাগ থাকে। বড়দের গায়েও কখনও কখনও গরম কালে খুব অস্পষ্ট একরকম দাগ দেখা যায়।

গভীর জঙ্গলের পাশে ঘাসে ঢাকা জমিতে বরাবর একই জায়গায় এরা চরতে ভালোবাসে। দল বেঁধে না থেকে এরা একা একা কিংবা দু'টিতে মিলে চলাফেরা করে। জঙ্গলে প্রচুর হগ-ডিয়ার থাকলেও এ নিয়মের অন্যথা হয় না।

খুব সকালে কিংবা সন্ধ্যায় শিকারী এদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। হাতির পিঠে বসে এদের শিকার করা খুব সহজ। এদের মাংস খেতে ভালো। ভয় পেলে অনেকটা চিতলের মতো চিৎকার ক'রে ওঠে। বাঘ আর চিতার জ্বালায় এরা অস্থির হয়।

মা উ স - ডি য়া র

এই জাবর-কাটা হরিণের হিন্দী নাম 'পিসোরা'। মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো বাঁশের জঙ্গলে, দাক্ষিণাত্যে আর পশ্চিমঘাট জঙ্গলে 'মাউস-ডিয়ার' দেখা যায়। এদের মুখ ইঁদুরের মতো ছুঁচলো। 'মাউস' বা ইঁদুর নামটা বোধহয় তার থেকেই এসেছে। দেখতে অনেকটা বড় খরগোশের মতো। লম্বায় তেইশ-চব্বিশ ইঞ্চি আর উচ্চতায় তেরো-চোদ্দ ইঞ্চি।

এদের গায়ের রঙ ধূসর বাদামী, নিচের দিকে সাদা। গায়ে আছে লম্বালম্বি দু'টি হলদে সাদা মোটা লাইন ; একটি লাইন ঘাড় থেকে পিঠ পর্যন্ত, অন্যটি গলা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত। তা ছাড়া গায়ে বড় বড় হলদে সাদা ফোঁটাও অনেক। পা খুবই সরু। শিং নেই। কিন্তু মুখের দু'ধারে আছে দু'টি লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁত ; দরকারমতো নড়ানো যায় বলে শত্রুকে এই দাঁত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা চলে।

ড্যান্সিং ডিয়ার

মনের আনন্দে মাঝে মাঝে নেচে বেড়ায় বলে এই হরিণদের বলে 'ড্যান্সিং ডিয়ার'। এদের দেখা যায় মণিপুরের লগটাক হ্রদের কাছে। এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একটি ভাসমান ঘাসের দ্বীপ তৈরি করা হয়েছে, আর অনেক খরচ ক'রে খাল কাটা হয়েছে দেখবার সুবিধের জন্যে। এদের কিছু নমুনা দেখা যাবে কলকাতা আর দিল্লীর চিড়িয়াখানায়।

ড্যান্সিং ডিয়ার দেখতে বড়ই সুন্দর। কপালের ওপরের শিং দু'টো সামনের দিকে মেলে থাকে, আর তার ওপরকার বড় বড় দু'টো শিং অতি সুন্দরভাবে পেছনে হেলানো থাকে।

কস্তুরী হরিণ

হিমালয় পর্বতে, অন্তত আট হাজার ফুট উঁচুতে, এই দুষ্প্রাপ্য 'কস্তুরী হরিণ' দেখা যায়। ইংরেজিতে এদের বলে 'মাস্ক ডিয়ার'। আকারে বড় হয় না। এদের পেছনের পা খুব লম্বা। মুখে নিচের দিকে দু'ধারে দু'টি তীক্ষ্ণ লম্বা দাঁত। এদের নাভিদেশে পাওয়া যায় সেই দুর্লভ মৃগনাভি বা কস্তুরী, যার জন্যে শিকারীর হাতে এদের প্রাণ দিতে হয়।

নীলগাই

নাম শুনে নীলগাইকে গরু মনে করলে ভুল হবে। আসলে এরা অ্যান্টিলোপ জাতের হরিণ। অথচ এই নামের জন্যে হিন্দুদের মধ্যে নীলগাই সম্বন্ধে অনেক রকমের কুসংস্কার আছে। হিন্দু গ্রামের কাছে নীলগাই মারলে শিকারীর অনেক বিপদ হতে পারে। এর মাংস খেতে গোঁড়া হিন্দুদের খুবই আপত্তি। তাই নীলগাই মেরে অনেক শিকারী মজ্জাস্থি, জিভ ও যকৃৎ ছাড়া খাবার জন্য আর কিছু নিতে চান না। অত বড় জন্তুর মাংস হিন্দুরা ছোঁবে না কুসংস্কারবশত।

লম্বায় নীলগাই প্রায় সাড়ে ছ' ফুট আর ওজনে ছ'-সাত মন। শুধু পুরুষদেরই শিং হয়। সাধারণত আট-ন' ইঞ্চি; তবে পৌণে বারো ইঞ্চি শিং-ও দেখা গেছে। এদের শিং নিচের দিকে তিন কোণা মতন; ওপর দিকটা গোল। দেখতে এত বড় অথচ শিং কী বাজে!

এদের সামনের পা পেছনের পায়ের তুলনায় বেশি লম্বা; তাই চেহারাটা তেমন সুন্দর নয়। বড় মদ্দাদের গায়ের রং গাঢ় নীলাভ অথবা নীলচে কালো। পেট, ল্যাজের নিচেটা, ঠোঁট, দু'গালের দু'টি ক'রে দাগ—সবই সাদা। মাদীদের রং বাদামী। যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রী নীলগাইয়ের ঘাড়েও কেশরের মতো বড় বড় লোম থাকে; কিন্তু কেবল পুরুষেরই গলায় লোমের গুচ্ছ। গলার এই লোম সাধারণত কালচে রঙের হয়; কিন্তু গ্রীষ্মকালে মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ আর গুণা জেলায় আমি পুরুষ নীলগাইয়ের গলায় একেবারে সাদা দাড়ির মতো লোম দেখেছি। গরমের সময় মাদীর রঙ অনেকটা হলদে বাদামী হয়ে যায়, আর পুরুষ নীলগাই দেখতে বেশি নীল হয়। ধূসর বা কালচে ভাব খুব কমে যায়। ঐ সময় তাদের গায়ের রঙ একে-বারে নীল হয়ে যেতেও আমি দেখেছি। এদের ল্যাজ প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা; ল্যাজের শেষ দিকটায় লোমের গুচ্ছ।

এরা পাতলা জঙ্গল, ঝোপঝাড় থাকা খোলা জায়গা অথবা ঘাস-বহুল পাতলা পাহাড়ী জঙ্গল পছন্দ করে বেশি। এদের খুব বেশি জলের বোধহয় দরকার হয় না।

বছর বছর এদের অন্তত দু'টি ক'রে বাচ্চা হয়, প্রায়ই বর্ষার কিছু আগে। এরা আট, দশ কি পনেরোটিতে মিলে দলবদ্ধ হয়ে চলে। কিন্তু অনেক সময় শুধু একটি বুড়ো পুরুষ নীলগাইকে একা অথবা আরও একটিকে নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়।

সকাল প্রায় দশটা পর্যন্ত তারা চরে বেড়ায়; দুপুরে বিশ্রাম ক'রে বেলা চারটে নাগাদ উঠে পড়ে, আবার সারারাত ধরে চরে বেড়ায়। এরা জমির ফসল খায়ও যেমন, পায়ে মাড়িয়ে নষ্টও করে তেমনি।

নীলগাই জঙ্গলের একই জায়গায় মলত্যাগ করে। কেন যে করে

ঠিক জানা যায় না। অনেকের মতে, গণ্ডারদের মতো তারা এইভাবে তাদের কাছ-ছাড়া সঙ্গীদের জানিয়ে দেয় তারা কোথায় আছে। অ্যান্টিলোপ শ্রেণীর হরিণদের এটা একটা বিশেষত্ব।

এদের চামড়া দিয়ে সুটকেস এবং আরও অনেক জিনিস তৈরি হয়। তাই শিকারীরা প্রায়ই চামড়ার লোভে নীলগাই মারে। এদের পরম শত্রু বাঘ। আর এদের মধ্যে আত্মরক্ষার খুব চেষ্টা নেই। বুদ্ধি কম ; চেষ্টাও করে না এমন জায়গায় দৌড়ে পালাতে, যেখানে তাকে ধরা শক্ত।

কৃ ষ্ণ সা র

অ্যান্টিলোপ হরিণদের মধ্যে পুরুষ কৃষ্ণসার সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ। এদের ইংরেজি নাম 'ব্ল্যাক বাক'। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশে এরা এক সময় দলে দলে চরে বেড়াত, কিন্তু চোরা শিকারীর নিষ্ঠুরতায় এদের সংখ্যা সব জায়গাতেই কমে এসেছে। এখনও যে টিকে আছে, তার কারণ দু'টি—প্রথমত, এদের জন্মহার বেশি ; দ্বিতীয়ত, প্রাণিজগতে এদের মতো ক্ষিপ্রগতি আর কেউ নয়। এমন কি শিকারী চিতাও দূরপাল্লার দৌড়ে এদের কাছে হেরে যায়। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে এরা বহুদূর যেতে পারে ; দমও অসম্ভব। এক লাফে বিশ-বাইশ ফুট পার হয়ে যায়।

বুড়ো মাদীরাই প্রকৃত দলপতির কাজ করে, পুরুষ কৃষ্ণসার থাকে পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। সাধারণত মার্চ মাস এদের স্ত্রী-পুরুষে জোড় বাঁধার সময়।

যখন জন্মায় তখন এদের রঙ থাকে বাদামী ; ক্রমশ গাঢ় হতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত পুরুষের রঙ হয় পিঠের দিকে কালো কিংবা ঘোর কালচে বাদামী, পেট সাদা, গলায় আর দু'চোখ ঘিরে সাদা দাগ। দেখে মনে হয়, পিঠের কালো আর পেটের সাদা রঙের মধ্যে যেন একটি সরল রেখা টেনে দিয়েছে। মাদীর রঙ বাদামী, তাতে একটু হলুদের ছোঁয়া। কয়েকটি সাদা কৃষ্ণসারও দেখা গেছে ; তবে এরা সংখ্যায় খুবই কম।

শুধু মদ্দারই শিং হয়। তাদের শিং লম্বায় প্রায় শরীরের সমান। তিরিশ ইঞ্চি উঁচু, সাড়ে তিন ফুট লম্বা, চব্বিশ সের ওজনের পুরুষ কৃষ্ণসারের শিং লম্বায় প্রায় তিরিশ ইঞ্চি হতে পারে। আটাশ ইঞ্চি হলে বেশ ভালো। বাইশ থেকে ছাব্বিশ ইঞ্চি হলেও খারাপ নয়। শিং খসখসে; তাতে অনেক খাঁজ কাটা এবং কর্ক-স্ক্রুর মতো প্যাঁচানো। তবে শেষের দিকটা মসৃণ। তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিং বাড়ে।

এরা সাধারণত দশ-পনেরোটিতে মিলে দল ক'রে থাকে। পুরুষ কৃষ্ণসারকে মাঝে মাঝে দলপতিত্ব নিয়ে লড়তে হয়। ক্ষেতে কি ঘাসের ময়দানে এরা রাতে, একটু সকাল পর্যন্ত চরে; দুপুরে বিশ্রাম করে। সন্ধ্যায় পুরুষ কৃষ্ণসার একটু একলা চরতে ভালোবাসে। সেই সুযোগ নিয়ে পরের দিন সকালেই শিকারী তাকে মারবার জন্যে বেরিয়ে পড়েন। এদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর বলে শিকারী সহজে এগোতেই পারেন না।

অনেক বছর আগে রাজনন্দ-গাঁয়ের কাছে এক জঙ্গলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

অতি সন্তর্পণে পাথরের আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে যেমন মাথা তুলেছি, অমনি ছ'-সাতটি মাদী কৃষ্ণসার মদ্দাটিকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। রাইফেল নামিয়ে নিলাম। কেননা, স্ত্রী কৃষ্ণসারদের না মেরে পুরুষটিকে মারবার কোনো উপায় ছিল না।

শিকারীকে তাই অনেক সময় নানারকম কৌশল করতে হয়। কৃষ্ণসার সাধারণত গ্রামের লোকদের খুব ভয় করে না; তাই হয় তাদের সঙ্গে নিয়ে, নয় গরুর গাড়ির ভেতর থেকে কিংবা হাঁটিয়ে ঘোড়া নিয়ে যেতে যেতে, আড়াল থেকে শিকার করা হয়। চোখে কিছু অদ্ভুত ঠেকলে মাঝে মাঝে তারা কৌতূহলবশে এগিয়ে এসে বোকার মতো প্রাণ দেয়। এরা সাধারণত একই জায়গায় নীলগাইয়ের মতো মলত্যাগ করে। মানুষ তার সুযোগ নিয়ে এদের খুঁজে বার ক'রে মারে।

চৌ শি ঙ্গা

চৌশিঙ্গা প্রধানত দেখা যায় মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ আর উত্তর-প্রদেশে। বড় বড় গাছের জঙ্গল কি ঝোপওয়ালা জঙ্গল দুইই এদের পছন্দ। কিন্তু তবু এদের খোলা জায়গা আর ঘাস চাই। জল তো বটেই। গভীর জঙ্গলে ঘাসের ময়দান থাকলে আর জল যদি কাছে থাকে, সবচেয়ে ভালো। দুপুরে একবার তো জল খেতেই হবে। এদেরও অভ্যেস একই জায়গায় মলত্যাগ করা।

এরা হালকা বাদামী রঙের; কিন্তু এদের পায়ের ভেতর দিক আর পেটের কাছটা সাদাটে।

এদের মধ্যে শুধু মদ্দাদের দু'জোড়া ক'রে শিং হয়। চোখের সামনের দু'টি প্রায় দু' ইঞ্চি ক'রে, আর তার ওপরের দু'টি প্রায় চার ইঞ্চি। বড় মদ্দার ওজন প্রায় পঁচিশ সের; উচ্চতায় প্রায় পঁচিশ ইঞ্চি।

এরা প্রায়ই একলা থাকে; খুব বেশি হলে, বার্কিং ডিয়ারের মতো দুজনে মিলে থাকে। শীতকালে দু'টি কি তিনটি বাচ্চা হয়।

পালাবার সময় এরা মাথা নিচু ক'রে ছোটে। কিন্তু কৌতূহলী বলে মাঝে মাঝে থেমে পড়ে, তাতেই এরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনে।

চি ঙ্কা রা

রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ আর মধ্যপ্রদেশে সাধারণত এদের পাওয়া যায়। ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'র‍্যাভীন ডিয়ার'। খোলামেলা ঝোপওয়ালা জঙ্গলে, নিচু পাহাড়ের পাদদেশে আর নালা কিংবা গভীর সংকীর্ণ ফাটলের কাছাকাছি থাকতে এরা ভালোবাসে। একেবারে খোলা মাঠ কিংবা গভীর জঙ্গল এদের পছন্দ নয়।

এদের দল বড় হয় না; খুব বেশি হলে তিন থেকে ছয়ই যথেষ্ট। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকারে এরা চরে। অনেক সময় কৃষ্ণসারদের সঙ্গে, কখনও কখনও নীলগাইদের সঙ্গেও থাকে।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিং হয়। মদ্দাদের শিং সাধারণত আট ইঞ্চি থেকে তেরো ইঞ্চি, আর মাদীদের চার ইঞ্চি থেকে আট ইঞ্চি। পুরুষের শিং প্যাঁচানো-প্যাঁচানো, কিন্তু মাদীর শিং প্যাঁচানো নয়। তাছাড়া খুব সরু। বুকের রঙ গাঢ় বাদামী; চিবুক আর পেট পেছনদিকে সাদা। যেন কেউ পরিষ্কার লাইন টেনে বাদামী উপরি-ভাগ থেকে সাদা নিম্নভাগ আলাদা ক'রে দিয়েছে। নাকে বাদামী দাগ আছে; তার উপর সাদা সাদা চিহ্ন। ল্যাজ কালো। ল্যাজটি সব সময়েই নড়তে থাকে। তার ফলেই ওরা ধরা পড়ে যায়। হাঁটুর কাছে লোমের গুচ্ছও কালো। উচ্চতায় এরা প্রায় পঁচিশ ইঞ্চি, আর ওজনে তেইশ সের।

খুব জোরে এরা দৌড়ে পালায়; তাই শিকার করা খুব শক্ত। তবে কৌতূহলী বলে মাঝে মাঝে থেমে দেখতে চায় কী ব্যাপার। এত সজাগ হয়েও এই দোষেই এরা মরে। সন্দেহ হলে এরা পা দিয়ে ঠুকে মাটিতে শব্দ করে, আর হাঁচির মতো একরকম আওয়াজ করে।

॥ শেষ ॥

বাঘ, হাতি আর হরিণ—জঙ্গলের এই তিন প্রাণীর মধ্যেই বোধ করি প্রকৃতির ভয়ংকরতা ও সৌন্দর্যের সব চেয়ে বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। এদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কত যে লেখা হয়েছে তার হিসেব নেই। কেউ লিখেছেন শিকারের রোমহর্ষক কাহিনী, কেউ বা করেছেন এদের জীবন নিয়ে প্রাণীবিদ্যার তথ্যবহুল গবেষণা। কিন্তু এমন বইয়ের সত্যিই অভাব ছিল যেখানে শুধু রোমাঞ্চকর কাহিনীই নয়, একাধারে এইসব বন্যজন্তুর স্বভাব ও জীবনযাপন নিয়ে সত্যিকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে হয়েছে শিকারের পদ্ধতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পথনির্দেশ। 'বাঘ হাতি হরিণ' বাংলা ভাষায় সেই অভাব মোচন করলো। শুধু ছোটদের নয়, সব বয়েসীদেরই বইটি সুখপাঠ্য মনে হবে। আর হবু শিকারীদের তো এটি হবে খুব দরকারী সঙ্গী।

এই বইয়ের লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসামান্য এক কৃতী ছাত্র (জন্ম ১৯০২)। শ্রেষ্ঠ দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় ইতিহাসের অধ্যাপনা দিয়ে। তারপর তিনি প্রবেশ করেন আইনের ক্ষেত্রে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট'ও তিনি লাভ করেন। ক্রমশ তিনি হন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট। কিশোর বয়স থেকেই শিকারে তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। পরিণত বয়সে তিনি হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ শিকারী। এই বই তাঁর শিকারী জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ফসল।

প্রচ্ছদপট ঃ রঘুনাথ গোস্বামী ● ভেতরের ছবি ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত